নবীজি ﷺ

যেমন ছিলেন তিনি

শাইখ ড. আয়িয আল-কারনী

নবীজি ﷺ

যেমন ছিলেন তিনি

সমকালীন প্রকাশন

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনেই রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।[১]

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ২১

প্রকাশকের কথা

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এই অন্ধকার নিঝুম-রাতের কিংবা মেঘে-ঢাকা পৃথিবীর নয়; এই অন্ধকার সভ্যতার সংকটের ফলে সৃষ্ট এক নিকষ অন্ধকার।

ততদিনে তাওহীদের পথ থেকে মানুষের বিচ্যুতি ঘটে গেছে। এক ইলাহ'র বদলে তারা তৈরি করে নিয়েছে নানা রঙের, নানা পদের ইলাহ। কখনো তারা আরাধনা করছে প্রকৃতির, কখনো বা সূর্যের। কখনো আগুনের কাছে চাইছে পরিত্রাণ। তারা বুঝতে পারে না—যে-আগুনের স্বভাব সব কিছু পুড়িয়ে ফেলা, সে-আগুন কীভাবে পরিত্রাণের নিয়ামক হতে পারে? তারা বোঝে না, তারা কখনো ঝুঁকে পড়ে চাঁদের দিকে; আরাধনায় লিপ্ত হয় সৃষ্টির প্রতি। কখনো তারা মাথা নত করে মাটির পুতুলের কাছে। তাদের ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ সব কিছুর ভার তারা ন্যস্ত করে লাত-উযযার কাঁধে। মানুষ ভুলে যায় তাদের প্রকৃত প্রভুকে। জগতে এভাবে নেমে আসে ঘোর অমানিশা...

প্রস্ফুটিত ফুলের মতো নিষ্পাপ এক কন্যা-শিশুর চিৎকারে কেঁপে ওঠে মরুভূমির প্রান্তর। কিন্তু কোনো এক মাতাল পিতার সে-দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সে মরুভূমির পথ মাড়িয়ে কন্যা-শিশুটি কোলে নিয়ে হাঁটতে থাকে। নির্জন এক প্রান্তর তার গন্তব্য। ধারণা তার—এই মেয়ে তার জন্য এক অভিশাপ! তার বিশ্বাস—সে তার প্রভুদের আরাধনায় ভুল করে ফেলেছে। তার প্রভুরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট। প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি বলেই প্রভুরা তাকে কন্যা সন্তান দান করেছে। এখন এই কন্যা-শিশুকে জীবন্ত দাফন করে দিলেই ঘটবে তার পাপমুক্তি। সে ছুটে চলে তার পাপমুক্তির পথে...

গোত্রে গোত্রে লড়াই শুরু হয়ে গেছে। এই লড়াই সম্মান রক্ষার লড়াই, মর্যাদা ধরে রাখার লড়াই। শৌর্য-বীর্যে কোন গোত্র শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণের জন্য যুদ্ধ দরকার। যুদ্ধই নির্ধারণ করে দেয় সামাজিক মর্যাদা।

যুদ্ধ মানে—শত্রু-শত্রু খেলা
যুদ্ধ মানে—তোমার প্রতি আমার অবহেলা।

গোত্র ভিত্তিক এই লড়াইয়ে মেতে ওঠে তারা। একে-অন্যকে আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ। একজন অন্যজনের বুকের ওপর উঠে তলোয়ার চালানো, ঘাড় থেকে মাথা আলাদা করতে পারার উল্লাস যেন নিত্যদিনকার ঘটনায় পরিণত হলো।

পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কর্তৃক স্থাপিত বায়তুল্লাহ চলে যায় মুশরিকদের দখলে। একে একে সেখানে জায়গা করে নেয় পৌত্তলিকদের পূজিত মূর্তিগুলো। মানুষ যখন এক আল্লাহর ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে বহু ইলাহকে গ্রহণ করে নেয়, তখন তাদের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় সভ্যতা। মক্কার প্রান্তরে নারী-পুরুষ উলঙ্গ হয়ে সম্মিলিত হয়। সম্মান আর সম্ভ্রমের মাথা খেয়ে তারা এটাকে গ্রহণ করে প্রভু-সন্তুষ্টির উপায় হিসেবে।

ইতিহাসবিদগণ এই সময়কে উল্লেখ করেছেন 'জাহিলিয়াত' হিসেবে। সে এক ঘোর অন্ধকার সময়ের উপাখ্যান। পৃথিবী যখন এমন অন্ধকার সমুদ্রে তলিয়ে গেল, যখন হিদায়াতের রাস্তা থেকে মানুষের চূড়ান্ত পদস্খলন ঘটল, যখন আল্লাহর যমীনে শয়তান আপাতদৃষ্টে বিজয়ী হয়ে উঠল, তখন এমন একজনের আগমন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল যিনি এই আল্লাহর যমীনে আবার ফিরিয়ে আনবেন তাঁর আইন, মানুষকে চেনাবেন হিদায়াতের প্রকৃত রাস্তা। ধ্বংসের মুখে নিপতিত হতে যাওয়া আশরাফুল মাখলুকাতকে যিনি ফিরিয়ে আনবেন ধ্বংসের ফাঁদ থেকে। যিনি হবেন মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক। যার হাতে থাকবে সত্যের ঝান্ডা আর মুখে থাকবে ঐশী বাণী; যিনি হবেন অকুতোভয়। যার সামনে পৃথিবী অঢেল রূপ আর ঐশ্বর্য নিয়ে ধরা দিলেও তিনি সত্যের পথ থেকে বিন্দু পরিমাণও বিচ্যুত হবেন না...

সুবহে সাদিকের এক পরম মুহূর্ত। মানবজাতির জন্য রহমত হয়ে ধরায় আগমন ঘটলো সেই মহামানবের। সেই মহান ব্যক্তির, যিনি একাধারে স্বামী, পিতা, রাষ্ট্রনায়ক, যোদ্ধা, বন্ধু, ভাই ও রাসূল। যিনি ওহী প্রাপ্ত হবার আগেই সবার কাছে

প্রিয় হয়ে ওঠেন। সবাই তাকে পূত-পবিত্র বলে জানত। তার চরিত্র, ন্যায়নিষ্ঠা ও আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ আর সবার সাথে সমানভাবে সু-সম্পর্ক রক্ষা করে চলার জন্য তিনি 'আল-আমীন' তথা 'বিশ্বাসী' উপাধিতে ভূষিত হোন।

এভাবেই আল্লাহকে ভুলে যাওয়া জনপদের মানুষগুলোর হিদায়াতের জন্য আল্লাহ-ই তাকে নিযুক্ত করলেন রাসূল হিসেবে, দান করলেন ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআন। যাকে তিনি রাসূল হিসেবে নিযুক্ত করবেন, তাকে সেভাবে প্রস্তুত করে নেবেন না, তা কী করে হয়? একজন রাসূলকে হতে হবে নির্ভীক, সীমাহীন দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যশীল, যুদ্ধের ময়দানে হতে হবে অকুতোভয় সৈনিক; রাষ্ট্রপরিচালনায় হতে হবে অগ্রগামী নেতা। দুঃখী মানুষের কাছে তাকে হতে হবে অত্যন্ত দয়ালু, পথহারার কাছে তাকে হতে হবে পরম বন্ধু। স্ত্রীর কাছে তাকে হতে হবে সর্বোৎকৃষ্ট স্বামী। জনপদের অধিবাসীদের কাছে তিনি হয়ে উঠবেন ন্যায়ের এক বিমূর্তপ্রতীক। স্রষ্টার আনুগত্যে তিনি হয়ে উঠবেন সবার জন্য অনুসরণীয়।

ইতিহাস সাক্ষী, এই সকল গুণাবলীর সবটাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তার পরম শত্রু, চরম বিরোধীরাও সাক্ষী দেয়, তিনি কখনোই মিথ্যে কথা বলেননি, তিনি কখনো লোক ঠকাননি, তিনি কখনো কারো হক নষ্ট করেননি। তিনি কখনো যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করেননি। তিনি তার বন্ধুদের কাছে ছিলেন সর্বোত্তম বন্ধু। তার শত্রুদের কাছে ছিলেন বিশ্বস্ত প্রতিপক্ষ। স্ত্রীদের কাছে ছিলেন সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ। জনগনের কাছে ছিলেন একজন ন্যায়বিচারক। যাকে বিশ্ব জাহানের অধিপতি রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন।

তিনিই সেই ব্যক্তিত্ব, যিনি পাল্টে দিয়েছেন পুরো বিশ্বকে। পৃথিবীর যে ভূ-খণ্ডে নেমে এসেছিলো জাহিলিয়াত, সেই ভূ-খণ্ড তিনি পরিণত করেছেন ভূ-স্বর্গে। যে-অঞ্চলের লোকেরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে দিনাতিপাত করত, একজন মানুষের ছোঁয়ায় তারা হয়ে উঠল মানুষের জান-মাল রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যারা কোথাও বিন্দুমাত্র ছাড় দিত না, পরে একজন মানুষের ছোঁয়ায় তারাই তাদের সাথীদের দিয়ে দিচ্ছিল নিজের ঘর-বাড়ি, গৃহপালিত পশু, আবাদি জমি। কে তাদের জাহিলিয়াত থেকে তুলে আনল? কে তাদের বানিয়ে তুলল সোনার মানুষ?

একজন মানুষের হাত ধরে পাল্টে গেল পৃথিবীর ইতিহাস। মোড় নিল বিশ্ব-রাজনীতি। সভ্যতা পেল নতুন এক মাত্রা। সেই মানুষের হাত ধরে পৃথিবীতে আবার নেমে এলো

হিদায়াতের ফল্গুধারা। সেই মানুষটার নাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। একজন মানুষ এসে পৃথিবীকে এমনভাবে নাড়িয়ে দিয়েছেন—এমন ঘটনা পৃথিবীতে আর দুটো নেই।

এই মহামানবের জীবনী ঘিরেই যুগের প্রখ্যাত দাঈ, শাইখ ড. আয়িয আল-কারনী রচনা করেছেন এক অনবদ্য উপাখ্যান। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের বিভিন্ন দিককে শব্দের পরম শৈল্পিকতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন তিনি। মানবতার মুক্তির দূত এই মহামানবের জীবনী তিনি এমন ঢঙে উপস্থাপন করেছেন, পড়তে গিয়ে পাঠকের মনে হবে যেন তারা চোখের সামনেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখতে পাচ্ছেন। বইটির নামও রেখেছেন সেভাবে—*মুহাম্মাদ : কাআন্নাকা তারাহু*।

শাইখ ড. আয়িয আল-কারনী প্রচুর বইপত্র লিখেছেন। তার অন্যতম সেরা কাজ এই *মুহাম্মাদ : কাআন্নাকা তারাহু*। আমরা বইটির নাম রেখেছি—*নবীজি* ﷺ।

নবীজি ﷺ গতানুগতিক কোনো সীরাতগ্রন্থ নয়। এখানে গৎবাঁধা স্টাইলে নবীজির জীবনের বর্ণনা নেই। নবীজির জীবনের বিভিন্ন দিক সুন্দর, সহজবোধ্য, সুখপাঠ্য এবং হৃদয়গ্রাহী করে লেখক আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। বইটি যে-কোনো সীরাত-প্রেমিক পাঠকের হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন বইটির লেখক, অনুবাদক, সম্পাদকসহ বইটির সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করেন। আমীন।

প্রকাশক

সমকালীন প্রকাশন

সম্পাদকের কথা

'সিরাতুননবী' মূলত বিশ্বমানবতার অনন্য একটি দর্পণ। এই দর্পণে মানব-জীবনের প্রতিটি অধ্যায়, পট-পরিবর্তন, কর্ম-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম-সাধনা প্রতিফলিত হয়েছে। ব্যক্তিজীবনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ শিশুর মতোই পৃথিবীতে আগমন করেছেন। এরপর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বেড়ে উঠেছেন। উপযুক্ত সময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। আসমানী-ধর্ম ও সংসার-ধর্ম সমান তালে পালন করেছেন। স্বামী ও পিতৃত্বের গৌরব অর্জন করেছেন। সাধারণ শ্রমিক, মেষ পালক, সেনাপ্রধান, বিচারক ও রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং সকল ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে বিশ্ববাসীর জন্য অনুসরণীয় আদর্শ রেখে গেছেন। তার রেখে যাওয়া এই সর্বজনীন আদর্শ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন—

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।[১]

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ২১

এই আদর্শগুলোই বিশিষ্ট দাঈ, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও বিদগ্ধ গবেষক ড. আয়িয আল-কারনী *মুহাম্মাদ : কাআন্নাকা তারাহু* নামে দুই মলাটে সংকলন করেছেন। বইটি প্রথমে ইংরেজিতে অনূদিত হয় *Muhammad As If You Can See Him* নামে। এরপর ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত হয় *নবীজি* ﷺ নামে। আরবী, ইংরেজি এবং এরপর বাংলায় রূপান্তরিত হওয়ায় সঙ্গত কারণেই ভাষা, চিন্তা ও উপস্থাপনায় কিছুটা দূরত্ব ও অসংলগ্নতা এসেছে এবং সেই সূত্র ধরে এসেছে কিছুটা ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যও।

আমার দৃষ্টিতে এই ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য খুবই প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিসঙ্গত। কারণ, ভাষা ও ভাবগত দিক থেকে মূল আরবী বইটি খুবই সংক্ষিপ্ত—তবে সুন্দর। আরবী ভাষাভাষীর কাছে এই ভাব ও ভাষা সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হলেও বাঙালি পাঠকদের কাছে এর হুবহু বাংলা অনুবাদ মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে বাঙালি পাঠক সাধারণত অপেক্ষাকৃত প্রলম্বিত উপস্থাপন-শৈলিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তাছাড়া হুবহু শাব্দিক অনুবাদ করতে গেলে আরবীর মূল ভাবটি বাংলা প্রতিশব্দের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আবেদন হারিয়ে ফেলত।

ইংরেজি অনুবাদকও সম্ভবত এমনটিই ভেবেছেন। একারণে তিনি শাব্দিক অনুবাদে না গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই অবলম্বিত অনুবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। তার এই সৃজনশীলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই সম্পাদনার সময় ইংরেজি থেকে আবার আরবীতে প্রত্যাবর্তন আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত মনে হয়নি।

তবে পর্যায়ক্রমিকভাবে তিন ভাষায় অনূদিত হওয়ায় ভাব ও বিষয়গত যে-দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল সম্পাদনার সময় সেটা দূর করা হয়েছে। সেই সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মূল নস ও সূত্র তুলে ধরা হয়েছে। যার ফলে বইটিতে এসেছে এক নতুন মাত্রা।

আশা করছি, বইটি পাঠককে সিরাতুননবীর দর্পণের সামনে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করবে। জীবন-সাধনায় সফল হওয়ার জন্য তার সামনে অনুপম আদর্শ তুলে ধরবে এবং জীবনের পট-পরিবর্তনে স্খলন থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে।

আকরাম হোসাইন
সম্পাদক, সমকালীন প্রকাশন

অনুবাদকের কথা

লেখার অক্ষরগুলোর এমনিতে আলাদা আলাদা কোনো মাহাত্ম্য নেই। তবে আমি যদি একপাশে শুধু লিখি 'মুহাম্মাদ' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আর অন্যপাশে পৃথিবীর সকল বর্ণ এনে জমা করে দিই তারপরেও ওই চারটি অক্ষরের ভারের কণা পরিমাণ ভারও অন্য লক্ষকোটি অক্ষর ধারণ করতে পারবে না।

ধরণির বুকে প্রাপ্ত সবচেয়ে বড় রহমতকে যদি কোনোদিন অক্ষরে ধারণ করা যেত তবে সেই চারটি অক্ষর মিলে হতো 'মুহাম্মাদ' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। আর এই অমূল্য চার অক্ষরে প্রস্ফুটিত ফুলকে আপনার সামনে তুলে ধরতে অক্ষরে সাজানো বাগানের নাম *নবীজি* ﷺ। লেখক ড. আয়িয আল-কারনী এক দুর্দান্ত মালীর কাজ করেছেন। এরকম মহামূল্যবান একটি বই ২০১৮ সালের অক্টোবরের প্রথমদিনে আমানতরূপে আমার কাছে এলো। সেই থেকে দীর্ঘ ত্রিশ দিনের একটানা পরিশ্রম শেষে নিজের প্রথম কাজের হাতেখড়ি হলো, ছোট হাতে অনেক বড় একটি কাজ হয়ে গেল। কতটুকু ইনসাফ করতে পেরেছি জানি না। আমার এই অযোগ্য হাতের কাজটি অবশ্য সুযোগ্য করে তুলেছে সমকালীনের দুর্দান্ত সম্পাদনা বিভাগ। মাসের পর মাস তারা কঠিন পরিশ্রম করে গেছেন। আল্লাহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কবুল করুন।

ইয়া আল্লাহ, দ্বীনের খিদমতে যদি এই হাত থেকে কোনো ভুল হয়ে যায় তবে মাফ করে দেবেন আর যদি নেকী লাভ হয়ে থাকে তবে তার পুরোটাই আমার পিতা-মাতার আমলনামায় যোগ করে দেবেন।

এই বইয়ের ভাব-গাম্ভীর্য রক্ষায় আমার ভাষাজ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহারের চেষ্টা করেছি প্রিয় পাঠক। তারপরেও কোথাও পরিপূর্ণতা না পেলে তা আমার ভুল বলে ধরে নেবেন এবং ক্ষমা করবেন। এই বইটি ইংরেজি অনুবাদক ফয়সাল ইবনু মুহাম্মাদ শফিককে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। ভাষা থেকে ভাষায় ছড়িয়ে যাক প্রেরিত মহামানবের দাস্তান। এই অনুবাদ করার সময়ে কতবার যে কেঁদে উঠেছি আমার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা পড়ে। অন্তরের চোখ দিয়ে বারবার তাকে খুঁজে ফিরেছি, তা বলতে পারছি না। এই বইয়ের পাতায় পাতায় মিশে আছেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এই অধম উম্মত তো কেবল তার কীর্তির খানিকটা নিজ বুলিতে আনতে পেরেই ধন্য।

দুআতে স্মরণ হওয়ার নিবেদনে

মুরসালিন নিলয়

ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

অবতরণিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। দরূদ ও সালাম তার সর্বোত্তম বান্দা—মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর এবং তার পরিবার পরিজন ও সকল সাহাবীদের ওপর।

অনেকেই দাবি করতে পারেন, এই বইটি আক্ষরিক অর্থে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ হয়নি। কারণ, এতে রচনা ও গবেষণার স্বাভাবিক রীতি অনুসরণ করা হয়নি; নির্দিষ্ট ব্যক্তির জীবন ও কর্মের সব দিক নির্মোহভাবে উপস্থাপন করে পাঠককে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মূল্যায়নের সুযোগ দেওয়া হয়নি; বরং লেখক নিজেই আবেগতাড়িত হয়ে তার একচেটিয়া গুণগান গেয়ে গেছেন।

তাই প্রথমেই বলে নিই, আলোচ্য বইটিতে কোনোরূপ মেকি নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করা হয়নি। অধিকন্তু আমার পক্ষে সেটা সম্ভবও ছিল না। কারণ, বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয় সাধারণ কারও জীবনী নয়; বরং সর্বকালের শ্রেষ্ঠমানব—আমার 'প্রাণপুরুষ' মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনচরিত।

এই বই কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের জীবনীগ্রন্থ নয়—যা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের সামনে রাজনৈতিক ইশতেহার পেশ করে তার ব্যক্তিগত মতাদর্শ অনুসরণে তাদের উদ্বুদ্ধ করে; বরং বইটি এমন এক মহামানবের জীবনীগ্রন্থ—যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর বিশেষ দূত; বিশ্বস্ত বার্তাবাহক এবং গোটা মানবজাতির জন্য রহমত।

আমার এই আবেগকে পক্ষপাত বলা চলে না এজন্য যে, এখানে দলবল ও লোক-লস্করে সুসজ্জিত কোনো রাজা-বাদশার গল্প বলা হয়নি। রাশি রাশি স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশু এবং ক্ষেতখামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রীর অধিকারী কোনো জমিদারের কাহিনিও আলোচনা করা হয়নি; বরং এখানে এমন এক মহামানবের গল্প আঁকা হয়েছে—যিনি আঁধার জগতের আলোকবর্তিতা ও মহান স্রষ্টার অবারিত দানস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন।

তাছাড়া, এখানে দোর্দণ্ডপ্রতাপের অধিকারী এমন কোনো শাসকের কথাও বলা হয়নি যে, সর্বত্র ত্রাসের রাজ্য কায়েম করে এবং অধীনদের ওপর দমন-পীড়ন চালায়; বরং এখানে এমন এক নিষ্পাপ ব্যক্তিত্বের কথা বলা হয়েছে—স্বয়ং স্রষ্টা যার বক্ষকে জ্ঞানের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং তার মর্যাদাকে সমুন্নত করেছেন।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচনার অহেতুক পরামর্শ এখানে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, বইটি কোনো কর্কশ কবি, বাগ্মি বক্তা, খ্যাতিমান স্কলার, ভবঘুরে দার্শনিক, কল্পনাপ্রবণ কথাসাহিত্যিক, কৃত্রিম গল্পকার অথবা সফল ব্যবসায়ীর জীবনালেখ্য নয়; বরং এটা সর্বশেষ নবীর জীবনালেখ্য—যাকে জিবরীল আমীন ফেরেশতার মাধ্যমে প্রত্যাদেশ করা হয়েছে; শাফাআতে কুবরা[১] ও সিদরাতুল মুনতাহায়[২] পৌঁছার বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। সর্বোপরি যার আনীত দ্বীনকে সর্বজনীন ও সর্বকালীন দ্বীন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

আপনি কি মনে করেন, যে-আদর্শ-মানব লক্ষ-কোটি শিষ্য ও ভক্তের হৃদয়ের স্পন্দন এবং সুমহান চরিত্র ও ঐতিহ্যের জীবন্ত নমুনা—তার জীবনী আলোচনায় ভক্তিশ্রদ্ধা ও আবেগ-অনুভূতির সংমিশ্রণ থাকতে পারবে না! এটাও কি সম্ভব?

এখানে তো এমন একজন আদর্শ-পুরুষের আলোচনা করা হয়েছে—যিনি জীবনের পরতে পরতে তার অনুসারীদের জন্য আদর্শ রেখে গেছেন। তাই সালাত আদায় করতে গেলে তার কথা মনে পড়ে। কারণ, তিনি বলেছেন—

---

[১] বিচার-দিবসে বিচারকার্য শুরু হওয়ার পূর্বে মানুষের মধ্যে চরম উৎকণ্ঠা কাজ করবে। সূর্য অতিশয় নিকটবর্তী হওয়ার কারণে তাদের কষ্টের কোনো সীমা থাকবে না। তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচারকার্য শুরু করার জন্য মহান আল্লাহকে সবিনয় অনুরোধ জানাবেন। এটাকেই শাফাআতে কুবরা বলে।—সম্পাদক।

[২] সপ্তাকাশের ওপরের বৃক্ষবিশেষ।—সম্পাদক।

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

তোমরা সেভাবেই সালাত আদায় কোরো, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।[১]

হজ আদায় করতে গেলেও হৃদয়ের দর্পণে তার ছবি ভেসে ওঠে। কারণ, তিনি বলেছেন—

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

তোমরা আমার কাছ থেকে হজের যাবতীয় বিধিবিধান শিখে নাও।[২]

এক কথায়, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজেই তার শ্রুত স্বরধ্বনি কানে বেজে ওঠে। কারণ, তিনি বলেছেন—

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

যে আমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত, সে আমার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।[৩]

অধিকন্তু মহান আল্লাহও তাকে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। কুরআনে কারীমে ঘোষিত হয়েছে—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ...[৪]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬৩১; হাদীসটি মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত।

[২] *সহীহ মুসলিম* : ১২৯৭; হাদীসটি জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত।

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৫০৬৩; *সহীহ মুসলিম* : ১৪০১; হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত।

[৪] সূরা আহযাব, আয়াত : ২১

সূচীপত্র

নবীজির নাম

মুহাম্মাদ—একটি প্রতীকী নাম। অর্থ—চিরপ্রশংসিত। এই একটিমাত্র নামের মাঝে তার সকল পরিচয় বাঙময় হয়ে ওঠে। কারণ, সর্বকালের সবার কাছে প্রশংসিত হতে হলে উন্নত নীতি-নৈতিকতা, উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি, সমুন্নত মানবিক মূল্যবোধ, অসম সাহসিকতা, অনিঃশেষ দয়া এবং ইহকালীন ও পরকালীন সংকট মুকাবেলায় অনুসারীদের যুগান্তকারী দিক-নির্দেশ প্রদানের অসামান্য যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। তবেই একজন মানুষ সকল যুগের সবার কাছে স্মরণীয়, বরণীয় ও প্রশংসিত হতে পারে।

তার আরেকটি নাম হলো আহমাদ—এই নামটিও একটি প্রতীকী নাম। অর্থ—অত্যধিক প্রশংসিত। ‘আহমাদ’ ও ‘মুহাম্মাদ’ একই ধাতুমূল থেকে উৎসারিত দুটি শব্দ। তার প্রশংসা ও গ্রহণযোগ্যতাকে সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতা দেওয়ার জন্যই এই নামের উদ্ভব হয়েছে। ঈসা আলাইহিস সালাম তার এই গুণবাচক নামটি উল্লেখ করে স্বজাতির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—

> **শীঘ্রই ‘আহমাদ’ নামের একজন নবী আসবেন; তিনি মানুষকে সত্যের পথে আহ্বান করবেন।**

এছাড়াও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বেশ কয়েকটি গুণবাচক নাম রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ‘আল আকিব’, ‘আল হাশির’, ‘আল মাহী’, ‘আল-খলীল’, ইত্যাদি।

'আল আকিব' বলতে সাধারণত সূত্রের শেষ অংক, অনুষ্ঠানের শেষ পর্ব এবং বংশীয় বা অন্যকোনো ধারার সর্বশেষ ব্যক্তিকে বোঝানো হয়। তিনি যেহেতু সকল নবীর পরে আগমন করেছেন এবং তার আগমনের মাধ্যমে নবুওয়াতের ধারার সুসমাপ্তি ঘটেছে, তাই তাকে 'আল-আকিব' বলা হয়।

'আল হাশির' বলতে সাধারণত ওই ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝানো হয়, যাকে কেন্দ্র করে কোনো সম্মিলন বা অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। যেহেতু হাশরের ময়দানে তিনিই প্রথমে উত্থিত হবেন এবং অন্যদের তার পরে উত্থিত করা হবে সেহেতু তাকে 'আল-হাশির' বলা হয়।

'আল মাহী' নামের অর্থ হচ্ছে নিশ্চিহ্নকারী। যেহেতু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নবী হিসেবে প্রেরণের মাধ্যমে মহান আল্লাহ সকল প্রকার অবিশ্বাসকে দূরীভূত করেছেন সেহেতু তাকে এই নামে স্মরণ করা হয়ে থাকে।

আর 'আল-খলীল' নামের অর্থ হচ্ছে অন্তরঙ্গা বন্ধু ও একান্ত প্রিয়ভাজন। আরেকটু ব্যাখ্যা করে বললে, যাকে হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে ভালোবাসলেও আশা মেটে না এবং যাকে সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করলেও শেষ পেয়েছি বলে মনে হয় না, সে-ই হলো খলীল—অন্তরঙ্গা বন্ধু।

সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে, স্বয়ং আল্লাহ যাকে মানব-বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন তিনি অবশ্যই সর্বদিক থেকে প্রশংসিত হবেন। মানুষের আশ্রয়স্থল হবেন। করুণার আধার হবেন। দুস্থের সহায় হবেন। বৃদ্ধের হাতের লাঠি হবেন। অন্ধের চোখের আলো হবেন এবং সকল বিষয়ে ও জীবনের সকল পর্যায়ে ঐশী সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন।

বাস্তবেও তাই হয়েছে। নবুওয়াতের ছোঁয়া তার এই উন্নত ব্যক্তিত্ব, ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধ এবং সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণকামিতার অনন্য সাধারণ গুণাবলিকে পূর্ণতা দান করেছে। তিনি জনবিচ্ছিন্ন ও নিরবচ্ছিন্ন সাধক থেকে চালকের আসনে উন্নীত হয়েছেন। অনুসারী থেকে পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। মহান আল্লাহর কৃপায় নিজেকে বিশ্ববাসীর জন্য করুণার আধার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এজন্য সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থেকেছেন।

সুতরাং, যতদিন আকাশের তারাগুলো দ্যুতি ছড়াবে, যতদিন প্রভাতের মৃদুসমীরণ বয়ে যাবে, যতদিন পাখ-পাখালির কল-কাকলিতে পৃথিবী মুখরিত থাকবে, ততদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীদের ওপর অবিরাম শান্তি বর্ষিত হোক।

নবীজির বংশ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লাম-এর বংশ-লতিকা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, তৎকালীন আরবে আদম আলাইহিস সালাম-এর যে-বংশধারাটি সবচেয়ে সুরক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ছিল সেই ধারায়ই তার আগমন। জাহেলিয়াতের অন্ধকার যুগে যখন ব্যভিচার ও লাম্পট্য আরবের লোকদের আভিজাত্যের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল তখনো এই ধারার বাহকগণ তাদের চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতা বজায় রেখেছেন। জাতি ও সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে তার ঊর্ধ্বতন প্রত্যেক পুরুষের মধ্যেই আমরা এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। আব্দুল্লাহ, আব্দুল মুত্তালিব, হাশিম, আবদু মানাফ এবং কুসাইসহ আদম আলাইহিস সালাম পর্যন্ত যারাই এই বংশে আগমন করেছেন, তারা সবাই সম্ভ্রান্ত ও সচ্চরিত্রবান ছিলেন। জাতি ও সমাজের অনুপম আদর্শ এবং সমকালের শ্রেষ্ঠ ও অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

সুতরাং, এটা হলফ করেই বলা যায় যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্ভ্রান্ত ও কুলীন বংশীয় ছিলেন এবং বংশপরম্পরায় আভিজাত্য ও নেতৃত্বগুণ লাভ করেছিলেন।

নবীজির জন্মভূমি

মহামহিম আল্লাহ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রাসূলের জন্মভূমি হিসেবে পবিত্র মক্কা নগরীকে নির্বাচন করেন। কারণ, এই নগরীটি তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রতিটি ধুলিকণা তাঁর কাছে অতিপ্রিয়। এর প্রতিটি অণুপরমাণু তাঁর করুণার চাদরে আচ্ছাদিত।

অধিকন্তু এই নগরীতেই পবিত্র কাবাঘর অবস্থিত। এখানে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ ইবাদাতে নিরত থাকতেন। এখানেই ওহীর শুভসূচনা হয়েছে। এখান থেকেই পৃথিবীময় সত্যের আহ্বান ছড়িয়ে পড়েছে। এখানেই আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেছেন।

তার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের সোনালি দিনগুলো এখানেই কেটেছে। এখানকার ইট-পাথর ও বালুকণা তার হৃদয়ের আবেগের সঙ্গে মিশে গেছে। একারণেই নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর যখন তার প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয় এবং মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেওয়া হয় তখন তিনি মদীনার নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সত্ত্বেও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ও বেদনামথিত কণ্ঠে বলে ওঠেন—

"

وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ ، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ

আল্লাহর কসম করে বলছি, তুমি স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও তাঁর প্রিয় ভূমি। আমাকে যদি চলে যেতে বাধ্য করা না হতো তবে আমি কখনোই তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।[১]

[১] *জামি তিরমিযী* : ৩৮৬০

অধিকন্তু মক্কা নগরীর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রাথমিক জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এই নগরীতেই তার ওপর প্রথম প্রত্যাদেশ হয়। এখানে থেকেই তিনি দ্বীনের প্রচারকার্য শুরু করেন। এখানেই প্রথম জামাআতের সঙ্গে সালাত আদায় করেন। কাজেই মক্কা ছেড়ে যেতে তার ভীষণ কষ্ট হয়। প্রিয়জনকে ছেড়ে দূরদেশে যেতে প্রবাসীর যেমন কষ্ট হয়, তার চেয়েও বেশি কষ্ট হয়। সারা জীবন তিনি এই কষ্টের বোঝা বয়ে বেড়ান।

মক্কা নগরীর সঙ্গে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই হৃদ্যতার বিবরটি মহান আল্লাহও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করেছেন। কুরআনে কারীমের ঘোষণা—

لَآ أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ① وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ②

আমি শপথ করছি এই নগরীর; আর আপনি এই নগরীর স্বাধীন নাগরিক।[1]

[১] সূরা বালাদ, আয়াত : ১-২

নবীজির শৈশব

এমনটা কিন্তু হয়নি যে, চল্লিশ বছর বয়সে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশ থেকে অবতরণ করে ইসলাম প্রচার শুরু করে দিয়েছেন; বরং তিনি সাধারণ শিশুর মতোই পৃথিবীতে আগমন করেছেন। বাবার ঔরসে তার জন্ম এবং মায়ের গর্ভে নয় মাস কাটিয়ে এ পৃথিবীতে তার আগমন। স্বাভাবিক মানুষের বয়স যে-রীতিতে বাড়ে, তারও বেড়েছিল সেভাবেই। এমন নয় যে, তার ক্ষেত্রে সময় দ্রুত বয়ে গেছে, আর তিনি হঠাৎ করে চল্লিশে উপনীত হয়েছেন; বরং অন্য মানুষ যেভাবে বেড়ে ওঠে—শৈশব, কৈশোর, যৌবন পেরিয়ে পরিণত হয়—তিনিও ঠিক সেভাবেই বেড়ে উঠেছিলেন।

শিশু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন ছিলেন? সহজ ভাষায় বললে, তিনি 'স্বাভাবিক' শিশু ছিলেন; কিন্তু 'সাধারণ' ছিলেন না। তিনি একই সাথে নিষ্পাপ ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন। ধীমান ও পবিত্র ছিলেন। অন্য শিশুদের সাথে তার পার্থক্য শুধু এখানেই যে, তিনি আল্লাহ কর্তৃক সব ধরনের বিকার ও বিপদ থেকে সুরক্ষিত ছিলেন। শিশু মুহাম্মাদকে আল্লাহ তাআলা আসন্ন জীবনের সুবিশাল দায়িত্বসমূহের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। শৈশবে তিনি যারই সান্নিধ্যে গিয়েছেন, সে-ই বুঝেছে যে, এই শিশুকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে মহৎ কোনো উদ্দেশ্যে; কিন্তু সে-উদ্দেশ্য যে কী, সেটা কেবল জানতেন আবু তালিব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্যান্য অভিভাবক—মা হালিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বা আব্দুল মুত্তালিব—কেউই সে-কথা জানতেন না।

আবু তালিবের জানার কারণ হলো, একবার সিরিয়া-যাত্রায় তিনি শিশু মুহাম্মাদকে সঙ্গো নেন। সেই যাত্রায় এক ধর্মযাজকের সঙ্গো আবু তালিবের দেখা হয়। ধর্মযাজক মুহাম্মাদের পিঠে নবুওয়াতের মোহর দেখে তাকে চিনে ফেলেন এবং আবু তালিবকে সতর্ক করে বলেন—'এই বালকটিই প্রতিশ্রুত শেষ-নবী। তাওরাত ও ইঞ্জিলে এরই আগমনের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। তবে এই সংবাদটি যেন একান্ত গোপন থাকে।'

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আসমানী সুরক্ষায় সুরক্ষিত। এর মানে এই নয় যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল বাহ্যিক বা শারীরিক দিক থেকে সুরক্ষিত ছিলেন; বরং সবার আগে আল্লাহ তাকে অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক দিক থেকে সুরক্ষিত করেছিলেন। এজন্যই শৈশব, কৈশোর ও তৎপরবর্তী জীবনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাঝে কখনোই নীচতা, হীনতা, মিথ্যের আশ্রয় বা দুর্ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ করা যায়নি; এমনকি শিশুদের ছেলেমানুষিও প্রকাশ পায়নি। এগুলো থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

তিনি ছিলেন নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী। তার চরিত্রে কোনো কলুষ বা কালিমা ছিল না। এভাবেই তাকে মানবজাতির সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছিল। তাই তিনি একজন স্বাভাবিক মানুষ হয়েও নবী হওয়ার অত্যুচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। ওহীর মাধ্যমে মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার গুরুদায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক বিবেচনায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শুধু একজন নেতা বলে থেমে গেলে ভুল হবে। কারণ, দুনিয়ায় অজস্র নেতা এসেছে; আবার চলেও গেছে। ক্ষমতার মোহ ও ধন-সম্পদের লোভ তাদের ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছে। কেউ তাদের মনে রাখেনি। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সারির কোনো নেতা ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একজন নবী। একজন পাঞ্জেরী। ক্ষমতা ও সম্পদের লিপ্সা কখনোই তার কাছে ঘেঁষতে পারেনি। তিনি যাবতীয় লোভ-প্রলোভন ও ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে আমাদের আলোর দিশা দিয়েছেন। সত্য ও সুন্দরের পথ দেখিয়েছেন। অন্যান্যদের মতো তিনি তার চিন্তা ও কর্মতৎপরতাকে কেবল পার্থিব-জীবনের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং দুনিয়ায় থেকে কীভাবে আখিরাতকে সুখময় ও সৌভাগ্যমণ্ডিত করা যায়—সেই চেষ্টাও করেছেন। অধিকন্তু আখিরাতের সুখ ও সৌভাগ্যকেই সর্বোচ্চ প্রাপ্তি বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি শুধু বাহ্যিক আচরণেরই সংস্কারক ছিলেন না; বরং ছিলেন আত্মোন্নয়নের মহান কারিগর।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী। তিনি এই জ্ঞান শুধু নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং সবার মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি মূর্খকে জ্ঞানের আলো দিয়েছেন। চিন্তকের চিন্তাকে শাণিত করেছেন। প্রজ্ঞাবানকে সমৃদ্ধ করেছেন। লেখককে নতুন ভাষা দিয়েছেন। বক্তাকে বাগ্মিতা দিয়েছেন। সর্বসাধারণকে সরল পথের দীক্ষা দিয়েছেন। এক কথায়, তার হাত ধরেই পৃথিবী সভ্যতার যুগে পদার্পণ করেছে। তার এই বহুমুখী তৎপরতা ও অবদান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

নিশ্চয় আপনি (মুহাম্মাদ) সরল পথ প্রদর্শন করেন।[১]

আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাম্রাজ্যবাদী সম্রাট ছিলেন না; বরং ছিলেন একজন নবী। আল্লাহর প্রেরিত দূত। শান্তির বার্তাবাহক। ধনী-গরিব, স্বাধীন-পরাধীন, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, আরব-অনারব—সকলের জন্য রহমত। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ।[২]

এই রহমতকে পূর্ণতা ও স্থায়িত্ব দেওয়ার জন্যই তিনি সবাইকে জাহান্নামের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কারণ, মানুষ যখন জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ হবে তখনই কেবল সে প্রকৃত শান্তি লাভ করবে। কেননা, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

“

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانِيٌّ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

[১] সূরা শূরা, আয়াত : ৫২

[২] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭

ওই সত্তার শপথ—যার হাতে আমার প্রাণ, এই জাতির অন্তর্ভুক্ত কোনো ইহুদী বা খ্রিস্টান যদি আমার ব্যাপারে জেনেও আমার আনীত দ্বীনের ওপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে নির্ঘাত জাহান্নামবাসী হবে।[১]

তার শৈশব থেকে যৌবনের পরিক্রমা লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, তিনি সব সময়ই ছিলেন সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত। তার ভাষা ছিল মাধুর্যপূর্ণ। ব্যবহার ছিল অমায়িক। এক কথায়, সুমহান চরিত্রের অধিকারী হতে হলে ব্যক্তির মাঝে যে-সকল অনন্য সাধারণ গুণের সমাবেশ ঘটার প্রয়োজন হয়, তার মধ্যে সে-সকল গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এই অনন্য সাধারণ গুণ ও বৈশিষ্ট্য ধারণ করেই তিনি পবিত্র, পূর্ণাঙ্গ ও মহানুভব মানুষে পরিণত হয়েছিলেন।

জীবনে কখনোই তার মুখ থেকে কোনো মিথ্যে উচ্চারিত হয়নি। গুরুতর কোনো ভুল বা বিচ্যুতিও প্রকাশিত হয়নি। চারিত্রিক বা নৈতিক স্খলনও ঘটেনি। সকল ঐতিহাসিক সম্মিলিত চেষ্টা করেও তার মধ্যে এধরনের কোনো ত্রুটি খুঁজে বের করতে পারবে না। তিনি ছিলেন বিনয়ী, বিশ্বস্ত, সত্যভাষী ও মহানুভব। এ কারণেই যুবক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন স্বজাতির সবার কাছে নন্দিত ও সমাদৃত।

এজন্য আমরা দেখতে পাই, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রকাশ্যে নবুওয়াতের ঘোষণা দেন তখন কাফিররা তার বিরোধিতা করলেও সততা ও সত্যবাদিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেনি। তাদের জন্য দ্বীনের দাওয়াত চরম অনভিপ্রেত হওয়া সত্ত্বেও তাকে ‘আল আমীন’ বা ‘বিশ্বস্ত’ বলে ডাকতে ভুল করেনি। অধিকন্তু তাদের মূল্যবান সামগ্রী সংরক্ষণের ব্যাপারে কেবল তাকেই নির্ভরযোগ্য মনে করেছে এবং তার কাছেই গোচ্ছিত রেখেছে। বিবাদ মীমাংসার জন্যও তারই শরণাপন্ন হয়েছে।

মোটকথা, নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারিত্রিক ও নৈতিক উৎকর্ষে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাহলে ভাবা যায়, নবুওয়াতলাভের পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবিক গুণাবলি ও চারিত্রিক পবিত্রতায় কতটা উন্নতি করেছিলেন!

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ১৫৩; হাদীসটি আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

তার এই সুমহান চরিত্রের স্বীকৃতি দিয়ে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।[১]

অবশ্য ইসলাম যখন ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই সততা, সত্যবাদিতা এবং চারিত্রিক শুচিতাই কাফিরদের গাত্রদাহের কারণে পরিণত হয়। তারা ভেতরে ভেতরে অক্ষম ক্রোধে ফেটে পড়ে। কেননা, এই সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাকে মিথ্যে অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত রেখেছিল। তার চারপাশে দুর্লঙ্ঘ্য নিরাপত্তা-বলয় সৃষ্টি করেছিল। আবু সুফিয়ানের মতো ধুরন্ধর ব্যক্তিও নাজাশীর সামনে সত্য স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

[১] সূরা কালাম, আয়াত : ৪

নবুওয়াত

অপেক্ষার সুদীর্ঘ প্রহর শেষে পৃথিবীবাসীর মুক্তির বার্তা নিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন হয়। কতই-না অসাধারণ ছিল সে-আগমন! যে আগমনে পৃথিবীর ভাগ্যাকাশে শান্তির সূর্য উদিত হয়; ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে যায়। আরবের সাধারণ নাগরিক ও যাযাবর-শ্রেণি তো বটেই; ভিনদেশি শাসকগণও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। তার প্রচার করা বাণী সবার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ইতিহাস যেন থমকে দাঁড়ায়। কুরআনের ভাষায়—

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۝١ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۝٢ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۝٣

তারা পরস্পরে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? মহা সংবাদ সম্পর্কে, যে-সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে।[১]

এটা সেই সময়ের কথা, যখন পৃথিবীতে কোনো নবী না আসার প্রায় ছয়শ বছর পার হয়ে গেছে। ঈসা আলাইহিস সালাম-এর মুষ্টিমেয় অনুসারী ব্যতীত সকলেই তার শিক্ষা ও আদর্শ ভুলে গেছে। পৃথিবী ও পৃথিবীবাসী হয়ে পড়েছে প্রাণহীন। খাবারের অভাবে যেমন মানুষের মৃত্যু হয়, তেমনই একজন নবী ও নববী শিক্ষার অভাবে পৃথিবীবাসী আত্মিক দিক থেকে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। এসময় নবীজি সাল্লাল্লাহু

[১] সূরা নাবা, আয়াত : ১-৩

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমন ছিল শুষ্ক ও অনুর্বর ভূমিতে এক পশলা বৃষ্টির মতো। তিনি এসেছিলেন আলো হয়ে। আর আলোকে কি কখনো রুখে দেওয়া যায়? মহান আল্লাহর বর্ণনায়—

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

তারা মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। যে-কোনো মূল্যে আল্লাহ তার আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন—যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভাষায়—

“

مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ

মহান আল্লাহ আমাকে যে-জ্ঞান ও পথ-নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার দৃষ্টান্ত হলো মুষলধারে বৃষ্টিপাত (—যা অনুর্বর ভূমিকে উর্বর করে এবং সমস্ত আবিলতা দূর করে)।[২]

অর্থাৎ, মহান একটি লক্ষ্য সামনে রেখেই আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দুনিয়ায় প্রেরণ করেন। আর সেই উদ্দেশ্যটি হলো তাওহীদ বা একাত্মবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা—যাতে পৃথিবীবাসী মহান আল্লাহকেই একমাত্র স্রষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করে। একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করে। এদুটি বিষয়ে অন্যকাউকে তাঁর শরীক বা সমকক্ষ মনে না করে। সর্বোপরি সবাই যেন গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে—‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’।

এই মহাসত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই তার আগমন। তাকে দিয়ে সত্যের প্রতিষ্ঠা আর মিথ্যে উৎপাটনই ছিল মহান আল্লাহর মূল লক্ষ্য। এজন্য তাকে সুস্পষ্ট প্রমাণপঞ্জি ও পরিপূর্ণ জীবন-বিধান প্রদান করা হয়েছে। তাকে শান্তি, নিরাপত্তা এবং ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের

[১] সূরা সফ, আয়াত : ৮

[২] *সহীহ বুখারী* : ৭৯, *সহীহ মুসলিম* : ২২৮২; হাদীসটি আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

মূর্ত প্রতীক বানানো হয়েছে। তার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির ওপর সালাত, সাদাকা, সিয়াম, হজ, যাকাত এবং অন্যান্য ইবাদাতের নীতি ও বিধান আরোপ করা হয়েছে।

উপরন্তু এই মহান লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাকে উত্তম চরিত্র, উন্নত নীতি-নৈতিকতা, অসম ধৈর্য ও সাহসিকতা এবং অনন্য সাধারণ মানবিক গুণাবলি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। সর্বোপরি তাওহীদ ও একাত্মবাদ প্রতিষ্ঠায় এই মানবিক আচরণ ও উন্নত গুণাবলি ব্যর্থ হলে তাকে সশস্ত্র জিহাদের আদেশ করা হয়েছে। মহান আল্লাহর এই প্রত্যক্ষ সাহায্য এবং দিক-নির্দেশ অবলম্বন করেই তিনি সমাজ থেকে শিরক ও পৌত্তলিকতার মূলোৎপাটন করেছেন। দেবতা ও প্রতীমাপূজার অবসান ঘটিয়েছেন। অন্যায়-অবিচার দূরীভূত করেছেন। অসত্য ও অসুন্দরের স্থলে সত্য ও সুন্দর প্রতিস্থাপন করেছেন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাপ-পুণ্যের পথও তিনি মানুষকে বাতলে দিয়েছেন। পুণ্যকর্মের প্রাপ্তি এবং পাপকর্মের শাস্তি ঘোষণা করে মানুষকে যুগপৎ উৎসাহিত ও নিবৃত্ত করেছেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আচার-আরণ ও নীতি-নৈতিকতা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। আর এটাই হবার ছিল। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তার আচার-আচরণকে পরিশীলিত করেছেন; চিন্তা ও চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করেছেন। তাই আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সকল মানবীয় গুণে পরিপূর্ণ। তিনি যখন কথা বলতেন, সত্য বলতেন। যখন উপদেশ দিতেন, সদুপদেশ দিতেন। যখন চুপ থাকতেন, আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকতেন। নিজেকে সব সময় ভালো ও কল্যাণের পথে নিরত রাখতেন। সবার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করতেন। সাধারণ মানুষের প্রতি সদয় আচরণ করতেন।

এই সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য তাকে এতটাই মহিমান্বিত করেছিল যে, অন্যকারও পক্ষে এগুলোর মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য ধারণ করা সম্ভবপর ছিল না। তার চেহারায় ছিল সত্যের আলো। চোখে ছিল বিশ্বাসের দীপ্তি। মুখে ছিল ভালোবাসার হাসি। হৃদয়ে ছিল অনিঃশেষ প্রভুপ্রেম ও উম্মাহর প্রতি অসামান্য দরদ-ব্যথা। এজন্য নিরিবিলি সময়ে তিনি চিন্তিত ও বিষণ্ণ থাকতেন। মানুষের সঙ্গে মিশলে স্বাভাবিক আচরণ করতেন। ঠোঁটের কোণায় হাসির মৃদু একটি রেখা ফুটিয়ে তুলতেন। যতক্ষণ কথা বলতেন, তার হাসির রেখা আভা ছড়াত। উপস্থিত লোকদের মধ্যে ভালোবাসা ও প্রশান্তির উদ্রেক করত। এভাবে তিনি হাসির আড়ালে চিন্তার অথৈ সাগর লুকিয়ে রাখতেন।

তিনি ইতিবাচক মানসিকতার চর্চা করতেন। শুভলক্ষণ গ্রহণ করে সম্মুখে এগিয়ে যেতে ভালোবাসতেন। নেতিবাচকতা ও অশুভলক্ষণ গ্রহণকে ঘৃণা করতেন। এধরনের মানসিকতা নিয়ে কোনো কাজের সিদ্ধান্ত ত্যাগ বা স্থগিত করাকে কাপুরুষতা বলে বিবেচনা করতেন। কারণ, ইতিবাচক মানসিকতা ও শুভলক্ষণ মানুষকে প্রেরণা জোগায়। নেতিবাচক মানসিকতা ও অশুভলক্ষণ তাকে হতাশ ও হতোদ্যম করে।

ক্ষমা ও দয়াগুণ তার চারিত্রিক ভূষণ ছিল। তিনি মানুষকে অসম্ভব রকম ভালোবাসতেন। তাদের অশোভন আচরণ সহ্য করতেন। অপরাধ ক্ষমা করতেন। অধিকন্তু তাদের অকাতরে দান করতেন। তার এই বদান্যতাকে মুক্ত বাতাস অথবা উদ্দাম মরুবৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করলেও অত্যুক্তি হবে না।

তিনি অসীম মহানুভবতা, শৈল্পিক আচরণ ও ভাষার জাদুতে খুব সহজেই মানুষকে প্রভাবিত করতে পারতেন। কখনো এমন হতো না যে, কেউ তার সংস্পর্শে এসেছে, অথচ প্রভাবিত হয়নি। তাকে দেখেছে, অথচ ভালোবাসেনি। তার সাথে পরিচিত হয়েছে, অথচ শ্রদ্ধায় নত হয়নি। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে, অথচ সমীহ করেনি।

তার মুখের ভাষায় মানুষের হৃদয় বন্দী হতো। তার অমায়িক আচরণে কৃতজ্ঞ হৃদয় নিঃশর্ত আনুগত্য ঘোষণা করত। তিনি এই প্রভাব ও আনুগত্যকে কাজে লাগিয়ে তাদের সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখাতেন। কল্যাণ-ধর্মের প্রতি আহ্বান করতেন। ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্য নিশ্চিত করতেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই ঈর্ষণীয় সাফল্য তার মুখের ভাষা ও বাহ্যিক আচরণেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তার আত্মিক ও অভ্যন্তরীণ বিকাশেও পরিব্যাপ্ত ছিল। মহান আল্লাহ তাকে স্থিরচিত্ত করে তৈরি করেছিলেন। ফলে সংশয় বা ভ্রষ্টতা কোনো দিন তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। চরম সংকট ও দুঃসময়েও তিনি সুস্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হননি।

এক কথায়, মহান আল্লাহ প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বাহ্যিক ও আত্মিক দিক দিয়ে এতটাই সমৃদ্ধ ও বিকশিত করেছেন যে, নিজেই তার প্রতি মুগ্ধতা প্রকাশ করে বলেছেন—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।[১]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ

আল্লাহর অনুগ্রহেই আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছেন।[২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا

তোমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে এবং তার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানে, সে-ব্যক্তি হলাম আমি।[৩]

অন্য হাদীসে এসেছে—

“

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে একমাত্র আমিই আমার পরিবারের নিকট সবচেয়ে উত্তম।[৪]

---

[১] সূরা কালাম, আয়াত : ৪

[২] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৯

[৩] *সহীহ বুখারী* : ২০; হাদীসটি উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[৪] *জামি তিরমিযী* : ৩৮৯৫; *সুনানু বায়হাকী* : ১৫৪৭৭; হাদীসটি উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অন্যত্র আরও বর্ণিত হয়েছে—

“

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দিতেই কেবল আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।[১]

সুতরাং, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর—যিনি আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সর্বদিক থেকে পূর্ণতা দান করেছেন। তাকে আদর্শমানব ও শ্রেষ্ঠ রাসূল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তার চিন্তা ও চরিত্র এবং নীতি ও নৈতিকতা পরিশুদ্ধ করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দেখভাল করেছেন। সর্বদিক থেকে সুরক্ষা দিয়েছেন এবং আমাদের তার অনুসারী হিসেবে মনোনীত করেছেন।

---

[১] *সুনানু বায়হাকী :* ২০৫৭১, *মাওযুআত আল-কুদায়ী :* ১১৬৫; *কাশ আল-খফা :* ৬৩৮ দ্রষ্টব্য

ধর্ম

ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম—যা একটি নিরাপদ ও সফল জীবনের নিশ্চয়তা দেয়। মহান আল্লাহ বলেন—

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

কেউ যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম সন্ধান করে তবে তা কস্মিনকালেও গ্রহণ করা হবে না। অধিকন্তু সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১]

ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়; বরং পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর জীবনব্যবস্থা। মহান আল্লাহ বলেন—

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

...আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।[২]

[১] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ৮৫

[২] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৩

এই ধর্ম মানুষকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে স্রষ্টার দাসত্বে আবদ্ধ করে। শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে একাত্মবাদের আলোয় প্রবেশ করায়। কুফরের অভিশাপ থেকে উদ্ধার করে ঈমানের আশীর্বাদে ভরিয়ে দেয়। দুনিয়ার মরীচকাময় জীবনের পরিবর্তে আখিরাতের শান্তিময় জীবনের স্বপ্ন দেখায়।

এই ধর্ম সর্বজনীন ও সর্বকালীন—সকল যুগের সকল শ্রেণির সকল মানুষের জন্য সমান উপযোগী। যুগের আবর্তনে এর আবেদন কখনো হ্রাস পাবে না। সমাজের পরিবর্তনে এর চাহিদায় কখনো ভাটা পড়বে না। এর অনুসারীরা কখনোই ভ্রষ্ট ও বিপথগামী হবে না। এমনকি পাপের পঙ্কিলতায় ডুবে গিয়েও হতাশ হয়ে জীবনের আশা ছেড়ে দেবে না। কারণ, এই ধর্মের বিধায়ক শিরক ব্যতীত সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এই বিশাল ছাড়ের কারণে তাকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হয় না। অধিকন্তু তিনি মানুষের ভেতরের ও বাইরের সমুদয় অবস্থা জানেন। তাদের মানবিক চাহিদা এবং দুর্বলতার ব্যাপারে পূর্ণ অবগতি রাখেন। এজন্যই তিনি ইসলাম ধর্মে বৈষয়িক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের সুষম ব্যবস্থা রেখেছেন।

মুসলিম ও ইহুদী-খ্রিস্টানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য এখানেই। কেননা, ইহুদীরাও আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষ জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিল; কিন্তু তারা সেই জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। ইলম অনুযায়ী আমল করতে পারেনি। ফলে অল্প দিনেই তারা বিপথগামী হয়ে পড়েছে এবং মহান আল্লাহর প্রচণ্ড ক্রোধে নিপতিত হয়েছে। খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে। তারা আল্লাহ-প্রদত্ত জ্ঞানের বাইরে গিয়ে সাধনা করার চেষ্টা করেছে। ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে তারা ভালো করলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।

পক্ষান্তরে ইসলাম হলো মানুষের স্বভাবজাত প্রাকৃতিক ধর্ম। এ ধর্মে ইলম-আমল এবং জ্ঞান ও কর্মের সুষম বণ্টন রয়েছে। ফলে এই ধর্মের অনুসারীরা দিকভ্রষ্ট হয় না। মহান আল্লাহর ক্রোধেও নিপতিত হয় না।

ইসলাম শাশ্বত ও সর্বোপযোগী হওয়ার কারণ হলো—এই ধর্মে মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাম্য ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধান রাখা হয়েছে। মিথ্যাচার, স্বেচ্ছাচার, ব্যভিচার, নিন্দা, পরনিন্দা, অসত্য সাক্ষ্য, অন্যায় পক্ষপাত, রক্তপাত,

আত্মসাৎ, মাপে কারচুপি এবং এজাতীয় আরও যে-সকল অপতৎপরতার কারণে মানুষের অধিকার খর্ব হতে পারে কিংবা তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে—সেগুলোকে হারাম করা হয়েছে।

সুতরাং, কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে আমরা বলতেই পারি—

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا

> **আমরা মহান আল্লাহকে প্রভু হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট। ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে কৃতজ্ঞ এবং মুহাম্মাদকে নবী হিসেবে পেয়ে ধন্য।**

ঐশীগ্রন্থ

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও মহাপবিত্র ঐশীগ্রন্থ হচ্ছে আল-কুরআন। একারণেই এই মহাগ্রন্থ সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। এর প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য, এমনকি প্রতিটি বর্ণ কেবল সত্যেরই সাক্ষ্য দেয়। এতে কোনো অসঙ্গতির স্থান নেই। মিথ্যের লেশমাত্র নেই এবং এটাই হবার ছিল। কারণ, এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে সর্বজ্ঞ ও চিরপ্রশংসিত মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। অর্থের দিক থেকে এটা যেরকম নিখাদ, ঠিক তেমনই এর শব্দচয়ন, বাক্যবিন্যাস, আদেশ-নিষেধের বর্ণনা এবং শিক্ষামূলক ঐতিহাসিক ঘটনার উদ্ধৃতিসহ আনুষঙ্গিক সমস্ত কিছুই একেবারে নিখুঁত ও অতুলনীয়।

এটা আল্লাহর বরকতে পরিপূর্ণ একটি কিতাব। যে-ব্যক্তি এই কিতাব তিলাওয়াত করে, অর্থ বুঝে অনুশীলন করে, শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক বিষণ্ণতা দূরীকরণে ব্যবহার করে, বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাতে এর সাহায্য গ্রহণ করে এবং বাস্তবজীবনে ঐশী শিক্ষার প্রতিফলন ঘটায় সে-ই কেবল এই কিতাবের বরকত ও কল্যাণ লাভ করতে পারে; এর মিষ্টতা আস্বাদন করতে পারে। যে-ব্যক্তি এই কিতাবের একটি বর্ণও তিলাওয়াত করে, সে-ও ন্যূনতম দশটি নেকী লাভ করে।

কুরআন মানুষের বিশ্বস্ত বন্ধু। দুঃসময়ের সঙ্গী। তার প্রতিটি কথা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা যায়। দুঃখ-দুর্দশা এবং অভাব-অনটনে তাকে পাশে পাওয়া যায়। ব্যক্তিক, পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যা ও সংকটে তার থেকে প্রভূত সাহায্য গ্রহণ করা যায়। এর কল্যাণ ও মাধুর্য সব কিছুর ঊর্ধ্বে। এটা জাদু নয়, কবিতাও নয়; এবং মানবীয় কোনো কথামালাও

নয়; বরং এটা একান্তই মহান আল্লাহর বাণী—তাঁর কাছ থেকে এসেছে; আবার তাঁরই কাছে ফিরে যাবে। তবে আমাদের সুবিধার জন্য জিবরীল আমীন ফেরেশতার মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হৃদয়ে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে মাত্র।

কুরআনের ভাষা টাকশালি আরবী। এর ভাষামাধুর্য বর্ণনাতীত। আলংকারিক মানদণ্ড অনতিক্রম্য। মানব-দানব কারও পক্ষেই কুরআনের এই ভাষা ও অলংকার-মান অতিক্রম করা সম্ভব নয়। আরবী ভাষায় পারদর্শী সকলেই এটা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন।

কুরআন একদিকে যেমন মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক ও কল্যাণের বাহক, অপরদিকে তেমনই মানসিক যন্ত্রণা নিরসক। স্বয়ং আল্লাহ এর প্রত্যক্ষ হিফাযতকারী। এর কল্যাণ প্রসারকারী। সুতরাং, শত্রু-মিত্র কারও পক্ষেই এতে সংযোজ-বিয়োজন অথবা পরিবর্তন-পরিবর্ধন সম্ভব নয়। এটি একটি শাশ্বত বিস্ময়—আগেও ছিল, এখনো আছে; ভবিষ্যতেও থাকবে।

কুরআন তার অনুসারীদের রক্ষাকবচ। মুক্তির মাধ্যম। সৌভাগ্যের সোপান। যে কুরআনের শিক্ষায় জীবন পরিচালনা করবে, তার জন্য চূড়ান্ত সাফল্য ও সুখময় জান্নাত অপেক্ষমাণ। কুরআনের এই কল্যাণময়তার প্রতি ইঙ্গিত করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ

কুরআন তিলাওয়াত করো; কেননা, কুরআন বিচার দিবসে তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ করবে।[১]

তিনি আরও বলেন—

“

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায়।[২]

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ৮০৪; হাদীসটি আবু উমামা আল বাহিলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] *সহীহ বুখারী* : ৫০২৭; হাদীসটি উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অপর এক হাদীসে এসেছে—

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا ، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে কারও মর্যাদা সমুন্নত করেন; আবার কাউকে অপদস্থ করেন।[১]

মহান আল্লাহ বলেন—

إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

নিশ্চয় এই কুরআন সর্বাধিক সরল পথ প্রদর্শন করে।[২]

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ৮১৭, হাদীসটি উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৯

নবীজির সত্যবাদিতা

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মতো সত্যনিষ্ঠ কারও আগমন হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না। কেননা, জীবনের দীর্ঘতম সময়ে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতে—কখনোই তার মুখ থেকে কোনো মিথ্যে শব্দ বের হয়নি; এমনকি হাসি-আনন্দ বা কৌতুকের ছলেও না। তিনি ব্যতীত অন্যকারও ক্ষেত্রে এটা কল্পনা করাও অসম্ভব। অধিকন্তু সত্য ছিল তার ভূষণ। তাই তিনি সমকালীন সাহাবী এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সত্যের ভূষণে ভূষিত করার লক্ষ্যে বলেছেন—

"

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا

নিশ্চয় সত্যবাদিতা পুণ্যের পথে পরিচালিত করে; পুণ্য জান্নাতের পথপ্রদর্শন করে। মানুষ সত্যের চর্চা করতে করতে একসময়ে আল্লাহর দরবারেও সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে... [১]

তিনি জানিয়েছেন, মুমিন ব্যক্তি পরিস্থিতির শিকার হলে কৃপণতা করতে পারে, ভীরুতাও প্রদর্শন করতে পারে—কিন্তু কখনোই মিথ্যে বলতে পারে না। অধিকন্তু মিথ্যের ব্যাপারে চরম হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন—

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬০৯৪; *সহীহ মুসলিম* : ২৬০৭; হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا

মিথ্যে পাপাচারের পথে পরিচালিত করে। পাপাচার জাহান্নামের দিকে ধাবিত করে। এমনকি একপর্যায়ে সে আল্লাহর নিকট চরম মিথ্যেবাদী বলে পরিগণিত হয়। (সুতরাং, হাসি বা কৌতুকের ছলেও কখনো মিথ্যে বলা যাবে না।)[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যবাদিতার সবচেয়ে বড় সাক্ষী স্বয়ং আল্লাহ। কারণ, তিনিই এই মানুষটিকে তার বার্তাবাহক করে সমস্ত জিন ও মানবজাতিকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহ্বানের দায়িত্ব দিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরম নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করেছেন। কোথাও পরিবর্তন-পরিবর্ধন অথবা সংযোজন-বিয়োজন করেননি; বরং সর্বক্ষেত্রে সততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন—যুদ্ধ-সন্ধি, রাগ-অনুরাগ, হাসি-আনন্দ, দুঃখ-বেদনা; আইন-বিচার—কোনো ক্ষেত্রেই অসত্য বলেননি। মিথ্যের আশ্রয় নেননি। কাউকে মিথ্যের অনুমতি বা বৈধতাও দেননি; বরং মিথ্যের পথ রুদ্ধ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করেছেন।

তিনি ছিলেন সবার আস্থাভাজন। পরিচিত-অপরিচিত, শত্রু-মিত্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার সাথেই সত্য বলতেন। লেনদেনে বিশ্বস্ত আচরণ করতেন। বিচারকার্যে সমতাবিধান করতেন। চুক্তিপত্র-স্বাক্ষরে নিষ্ঠার পরিচয় দিতেন। আইন ও বিধান প্রণয়নে সাম্য বজায় রাখতেন। এমনকি মৌখিক বক্তৃতা ও গল্পের আসরেও সত্যের প্রচার করতেন। কখনো কোনো ক্ষেত্রেই মিথ্যে বলতেন না। অবশ্য মিথ্যে বলা তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তাকে এধরনের গর্হিত কাজ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ করেছেন এবং এ থেকে তাকে রক্ষাও করেছেন।

সত্য কেবল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখের কথায়ই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তার অঙ্গভঙ্গি ও ইশারা-ইঙ্গিতও সত্যকে বহন করত। বিচার-কার্যে চোখের ইশারা ও টিপ্পনিকেও তিনি মিথ্যের আশ্রয় বলে মনে করতেন। কারণ, এতেও এক ধরনের সত্য গোপনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। একটি ঘটনা বর্ণনা

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬০৯৪; *সহীহ মুসলিম* : ২৬০৭; হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

করলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে—

মক্কা বিজয়ের দিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুপক্ষের সকলের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। তবে যাদের নিষ্ঠুরতা ও পাশবিকতা মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল তাদের এই ঘোষণার বাইরে রাখেন। অধিকন্তু তাদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই হত্যার নির্দেশ জারি করেন। এমনকি তারা যদি পবিত্র কাবাঘরও আঁকড়ে থাকে—তবুও। এধরনের নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও ক্ষমার অযোগ্যদের একজন ছিল আবদুল্লাহ ইবনু সাদ ইবনি আবি আশরাহ।

আবদুল্লাহ ইবনু সাদ জানত যে তাকে খোঁজা হচ্ছে। তাই সে প্রথমে আত্মগোপন করে। এরপর আত্মরক্ষার জন্য উসমান ইবনু আফফান রাযিয়াল্লাহু আনহু-র আশ্রয় গ্রহণ করে। উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু তাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে নিয়ে যান। আবদুল্লাহ পরপর তিনবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে হাত বাড়ায়; কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবারই তার হাত ফিরেয়ে দেন। চতুর্থবার তার সঙ্গে হাত মেলান এবং নিঃশর্ত আনুগত্যের শর্তে তার ক্ষমা মঞ্জুর করেন।

এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের কাছে গিয়ে বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কি এমন একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিও ছিল না, যে আমার হাত বাড়ানোর অনিচ্ছা দেখে তাকে হত্যা করতে পারত?'। তারা উত্তরে বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা তো আপনার মনোভাব বুঝতে পারিনি। আপনি কি একবার আমাদের চোখের ইশারায় বলতে পারতেন না?' তাদের এই প্রশ্নের উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'চোখের টিপ্পনি বা প্রতারণা নবীর জন্য বেমানান—অসম্ভব। (এজন্য আমি তোমাদের চোখ টিপে ইশারা করিনি।'[১]

মহান আল্লাহ বলেন—

لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ

যাতে তিনি সত্যবাদীদের তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।[২]

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৩৫৯, *সুনানুন নাসায়ী* : ৪০৬৭

[২] সূরা আহযাব, আয়াত : ৮

তিনি আরও বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।[১]

আরেক আয়াতে তিনি বলেন—

فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ

...যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্য তা মঙ্গলজনক হবে।[২]

বস্তুত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপাদমস্তক সত্যবাদী ছিলেন। আল্লাহর সঙ্গে, নিজের সঙ্গে, পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে এমনকি জানের দুশমনদের সঙ্গেও তিনি সততাপূর্ণ আচরণ করতেন। এক কথায়, 'সত্য' যদি রক্ত-মাংসে গড়া কোনো মানুষ হতো, তবে তার নাম হতো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

উল্লেখ্য যে, এই সততা ও সত্যবাদিতা প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহজাত ও স্বভাবজাত ছিল। নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্ব থেকেই আরবের লোকেরা তাকে 'আল-আমীন' তথা 'সত্যবাদী' ও 'বিশ্বস্ত' বলে সম্বোধন করত। যে-ব্যক্তি নবুওয়াতলাভের পূর্বেই সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত বলে সর্বমহলে সুপরিচিত ছিলেন ওহী অবতরণের পর তিনি না-জানি কতটা পবিত্র ও সত্যের মূর্তপ্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন!

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ১১৯

[২] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ২১

নবীজির ধৈর্য

বাংলায় 'ধৈর্য' বলতে সাধারণত রোগ-শোক, ব্যথা-বেদনা ও বিপদাপদ সহ্যের ক্ষমতাকে বোঝানো হয়। আর ইসলামের পরিভাষায় ধৈর্য একটি আত্মিক গুণ ও মানসিক শক্তি। এই শক্তিবলে মানুষ যাবতীয় দুঃখ-দুর্দশা বিনা অভিযোগে সহ্য করে; কেবল এই আশায় যে, আখিরাতে এর বিনিময় পাওয়া যাবে। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে। বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে; কিন্তু খুব কম মানুষই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং প্রতিদান লাভের আশায় এই কাজটি করতে পারে।

আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ নবী। উম্মাহর সর্বশেষ শিক্ষক। মানবতার সর্বোচ্চ আদর্শ। তাই মহান আল্লাহর প্রজ্ঞার দাবি এটাই ছিল যে, জীবনের সকল বিষয়ের মতো ধৈর্যের ক্ষেত্রেও তিনি মানব ও মানবতার জন্য উত্তম আদর্শ ও পর্যাপ্ত জ্ঞানোপকরণ রেখে যাবেন। একারণেই আমরা দেখতে পাই, তার জীবন ছিল নানামুখী সমস্যা ও জটিলতায় পরিপূর্ণ। তেষট্টি বছরের ক্ষুদ্র জীবনে তিনি কত যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন তার কোনো হিসেব নেই।

মানবজাতির ইতিহাসে অন্যকোনো নবী বা সাধারণ মানুষ তার ন্যায় এত প্রতিকূলতার শিকার হয়নি। তার জীবনে যেসকল শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে সেগুলো সহ্য করার তুলনায় মৃত্যুই হয়তো অধিকতর সহজ ছিল। কিন্তু তিনি কখনোই মৃত্যু কামনা করেননি। একটি বারের জন্যও মুখ ফুটে অভিযোগ করেননি; বরং সর্বদা আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থেকেছেন। সর্বাবস্থায় তার শোকর আদায় করেছেন। সংকল্পে অটল থেকেছেন। শুধু তাই নয়, রোগে-শোকে অধৈর্য হয়ে মৃত্যু কামনা

করতেও বারণ করেছেন। মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত নির্দেশনার কারণেই হয়তো তার পক্ষে এই অসম ধৈর্যধারণ সম্ভবপর হয়েছিল—

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ

আর আপনি ধৈর্যধারণ করুন। আপনার ধৈর্য তো কেবল আল্লাহরই জন্য।[১]

এজন্যই আমরা দেখতে পাই, তিনি ক্ষুধা-অনাহার, দুঃখ-দারিদ্র্য ও মাতৃবিয়োগের শোকাতুর মুহূর্তেও ধৈর্য ও সহনশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাকে পরিবার-পরিজন ও প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে; তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। তার ওপর ও তার প্রাণপ্রিয় সাহাবীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে, স্বজন ও অনুসারীদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে; তবুও তিনি সহ্য করেছেন।

যুদ্ধের ময়দানে শত্রুরা তার ওপর সশস্ত্র আক্রমণ করেছে, বেদুঈনরা তার সঙ্গে মূর্খসুলভ আচরণ করেছে, ইহুদী ও মুনাফিকরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, স্বজাতির লোকেরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে—তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। এছাড়াও আরও বহু উপায়ে তাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, পরীক্ষা করা হয়েছে; তিনি সব জায়গায় ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। ধৈর্যের অনলে জাগতিক মোহকে ভস্মিভূত করেছেন। তাই নারী, সম্পদ বা ক্ষমতার মোহ তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি; বরং জীবনের প্রতিটি ধাপে, নবুওয়াতের প্রতিটি পর্যায়ে অটল, অবিচল ও ধৈর্যশীল থেকেছেন।

বস্তুত সকল বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দুর্দশায় এই ধৈর্যই ছিল তার প্রধান অস্ত্র—একমাত্র অবলম্বন। যখনই শত্রুর ভয় তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে তখনই তিনি আল্লাহকে স্মরণ করেছেন। ধৈর্যকে তার আন্তরিক পরামর্শ জ্ঞান করে সান্ত্বনা লাভ করেছেন। কারণ, কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

সুতরাং, এরা যা বলে সে-বিষয়ে ধৈর্যধারণ করুন।[২]

[১] সূরা নাহল, আয়াত : ১২৭

[২] সূরা ত-হা, আয়াত : ১৩০

যখনই তিনি সহ্যের অতীত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন, তখনই নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছেন—

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

সুতরাং, এখন ধৈর্যধারণই শ্রেয়।[১]

এবং যতবারই তিনি শত্রুর অনিবার্য আক্রোশের মুখে পড়েছেন, এই আয়াত স্মরণ করে প্রত্যয় ফিরে পেয়েছেন—

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ

অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন অকুতোভয় পয়গম্বরগণ সবর করেছেন...।[২]

তিনি জানতেন, আল্লাহর সাহায্য অবশ্যম্ভাবী। তাই সাহায্য আসা পর্যন্ত অবিচল থাকতেন। ধৈর্যধারণ করে যেতেন। অনবরত ধৈর্যচর্চা ও অনুশীলনের কল্যাণে তিনি এতটাই উন্নতি সাধন করেছিলেন যে, সর্বাবস্থায় বিশ্বাস করতেন, তার সঙ্গে আল্লাহ আছেন। তিনি তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। একারণে শত্রুর চোখ রাঙানিতে তিনি ভয় পেতেন না। তাদের অভিশাপের পরোয়া করতেন না। তাদের নিপীড়ন ও উৎপীড়নে সিদ্ধান্ত থেকে একবিন্দুও টলতেন না। সর্বদা প্রশান্ত ও স্থিরচিত্ত থাকতেন।

তিনি পিতৃতুল্য চাচা, প্রিয় স্ত্রী ও প্রাণপ্রিয় সন্তান হারিয়েও ধৈর্যধারণ করেছেন। এমনকি পাশবিক উন্মত্ততায় যখন হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে হত্যা করা হয়, তখনো তিনি ধৈর্যহারা হননি। মানুষ তার প্রচার করা বাণী অস্বীকার করেছিল, তার পবিত্র স্ত্রীকে অপবাদ দিয়েছিল, তাকে কবি, জাদুকর, পাগল ও মিথ্যুক বলে টিটকারি করেছিল, এছাড়াও আরও বহু উপায়ে কষ্ট দিয়েছিল—তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। আল্লাহর সাহায্য ও প্রতিদানের আশায় অবিচল থেকেছেন। এভাবে নিজেকে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞদের আদর্শে পরিণত করেছেন।

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১৮

[২] সূরা আহকাফ, আয়াত : ৩৫

নবীজির মহানুভবতা

এই সৃষ্টিজগতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ছিলেন সবচেয়ে বড় দানবীর। শ্রেষ্ঠ মহানুভব। তার মতো দানবীর ও মহানুভব অতীতে কখনো জন্ম নেয়নি; ভবিষ্যতেও নেবে না। মহানুভবতা ছিল তার বসন ও ভূষণ। তিনি এই ভূষণে সবাইকে ভূষিত করতে চেয়েছেন। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রতিদান লাভের আশায় শত্রু-মিত্র, ধার্মিক-অধার্মিক নির্বিশেষে সবাইকে অকাতরে দান করেছেন। বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। নিজেকে বিপদের মুখে ফেলেও অন্যকে বিপদমুক্ত করতে এগিয়ে গেছেন। মহান আল্লাহর প্রতি তার এতটাই অগাধ বিশ্বাস ছিল যে, তিনি কোনো দিন দারিদ্র্যকে ভয় পাননি। নিজের বিপদের কথা ভেবে অন্যের সাহায্য ত্যাগ করেননি।

বদান্যতা, মহানুভবতা এবং পরোপকারের ক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতটাই অবদান রেখেছিলেন যে, তিনি মানবতার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। তার এই অনন্য সাধারণ মানবিক গুণাবলিতে বিমুগ্ধ হয়ে জনৈক আরব কবি বলেন—

স্রষ্টার একত্ব ঘোষণার জন্য যদি বহুত্বকে 'না' বলতে না হতো
তবে তার ভাষার অভিধান থেকে 'না' শব্দটি মুছে যেত।

আসলেই তাই! কারও আবদার বা আবেদনের বিপরীতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনোই 'না' বলেননি। আরবের হারাম, ইবনু জাদান ও হাতিমকে এখনো শ্রেষ্ঠ দানবীর বলে স্মরণ করা হয়; কিন্তু তারা কেউ-ই দানশীলতা ও মহানুভবতায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমতুল্য ছিলেন না।

এমনকি তার নিকট প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিলেন না; বরং এক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অতুলনীয়। অদ্বিতীয়। একবার তিনি এক ব্যক্তিকে পুরো এক পাল ভেড়া দান করেন। ভেড়াগুলো সংখ্যায় এত বেশি ছিল যে, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা ভরে গিয়েছিল। আবার এমনও হয়েছে যে, তিনি বিভিন্ন গোত্রপ্রধানদের মাথাপিছু একশ' করে উট দান করেছেন। আরেকবার একলোক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গায়ের জামাটিই চেয়ে বসে। তিনি তৎক্ষণাৎ পরনের জামাটি খুলে তার ইচ্ছে পূরণ করেন এবং এভাবে নিজেকে মানবতা ও মহানুভবতার মূর্তপ্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সাধারণ বিত্তশালীরা কাউকে কিছু দান করার পর আর্থিক বিনিময় না চাইলেও অন্তত এতটুকু আশা করে যে, লোকটি তাকে সম্মান করবে, ভালোবাসবে, সমীহ করবে কিংবা অন্তত নত হয়ে তার হাতে চুমু খাবে; কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি আর্থিক বিনিময় তো নয়ই; মানবিক কৃতজ্ঞতাটুকুও কখনো আশা করেননি। অধিকন্তু তিনি এতটাই বিনয়ী-বদান্য ছিলেন যে, কেউ তার কাছ থেকে কিছু যেচে নিলে মনে হতো, যাচনাকারীই তার প্রতি অনুগ্রহ করেছে। কবির ভাষায়—

প্রার্থনা করবে, তবে যাও মুহাম্মাদের কাছে।

প্রসন্ন একটি হাসি তোমার অপেক্ষা করছে।

তুমি চকিত চেয়ে দেখবে—

তোমার প্রাপ্তির হাসি তার দানের হাসিতে ম্লান হয়ে গেছে।

প্রয়োজনপ্রার্থীকে দেওয়ার মতো কিছু না থাকলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। চরম দারিদ্র্য ও অনটন সত্ত্বেও কৃতার্থতার সঙ্গে দান করতেন। দান করতে পেরেছেন বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন এবং মহান আল্লাহর কাছে এর বিনিময় ও প্রতিদান আশা করতেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়া মাত্রই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করে দিতেন। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কিছুই সংরক্ষণ করতেন না। তার দানের দুয়ার ছিল সবার জন্য উন্মুক্ত। কাউকেই তিনি খালি-হাতে ফেরাতেন না। আগন্তুক ও পরদেশি মুসাফিরদের পরমাত্মীয় হিসেবে গ্রহণ করতেন। সর্বস্ব উজাড় করে তাদের আতিথেয়তা করতেন।

পরিচিত-অপরিচিত, দেশি-পরদেশি, ইহুদী-মুশরিক-মুনাফিক—কেউ-ই তার মহানুভবতার পরশ থেকে বঞ্চিত হতো না। সবাইকে তিনি আশ্রয় দিতেন। মেহমানদারি করতেন। আপন বলে জানতেন। ক্ষুধার্তকে আহার দিতেন। বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিতেন। অভাবীকে সাহায্য করতেন। আত্মীয়দের সেবা করতেন। দান বা সেবা করে কখনো ক্লান্ত হতেন না। বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। কেউ সাহায্য চেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যেত না।

বরং অনেকে তো চাইতে এসেও কষ্ট দিত। তবুও তিনি কষ্ট প্রকাশ করতেন না। একবার এক বেদুঈন তার পরনের চাদর ধরে সজোরে টান দিয়ে বলে—'আল্লাহর দেওয়া ধন-সম্পদ থেকে আমাকে কিছু দান করুন। এগুলো জনসাধারণের সম্পদ। আপনার পৈতৃক সম্পদ নয়।' তার টান এতই জোরালো ছিল যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গলায় দাগ পড়ে যায়। তবুও তিনি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসেন এবং নির্দ্বিধায় তার প্রয়োজন পূরণ করেন!

যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে অথবা উপহার বা অন্যকোনো উপায় স্বর্ণ-রৌপ্য বা অন্যকোনো সম্পদ তার হস্তগত হলে তৎক্ষণাৎ জনসাধারণের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। নিজের জন্য একটা সিকি-আধুলিও রাখতেন না। তিনি স্বভাবগতভাবেই বদান্যতা ও মহানুভবতা পছন্দ করতেন। কৃপণতা ও সংকীর্ণতা অপছন্দ করতেন।

ব্যক্তিগতভাবে তিনি যেমন বদান্য ও মহানুভব ছিলেন তেমনই অন্যদেরকেও বদান্যতা ও মহানুভবতা অবলম্বনের উপদেশ দিতেন। আর বলতেন—

“

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

যে আল্লাহ এবং বিচারদিবসে বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমানদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করে। তাদের যত্ন-আত্তি করে।[১]

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬০১৮, ৬১৩৬, ৬১৩৮; *সহীহ মুসলিম* : ৪৭; হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে—

ُلُ امرئٍ في ظلِّ صدقتِه حتى يُفصَلَ بين الناسِ

বিচারদিবসে বিচার-কার্য সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেকেই তার দানের ছায়ার নিচে থাকবে।[১]

অপর এক হাদীসে এসেছে—

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

সাদাকা কখনো সম্পদ কমায় না।[২]

[১] *সহীহ ইবনু খুজাইমা* : ২৪৩১; হাদীসটি উকবান ইবনু আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; *সহীহ ইবনে হিব্বান* : ৩৩১০; *আবু নাঈম, আল হিলইয়াহ* : ৮/১৮১।

[২] *সহীহ মুসলিম* : ২৫৮৮; হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

নবীজির সাহসিকতা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিমূলক উপাদান ছিল আল্লাহর ওপর অটুট বিশ্বাস ও অগাধ নির্ভরতা। এই দুটি উপাদানই তাকে চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলির শীর্ষ চূড়ায় উন্নীত করেছিল। এজন্য যে-সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে আমরা চারিত্রিক ও মানবিক বলে বিশ্বাস করি, সে-সকল গুণ তার মধ্যে সর্বোচ্চ মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। অন্যভাবে বললে, তিনি সেসকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের আদর্শ ছিলেন। বীরত্ব ও সাহসিকতাও তার এমনই একটি গুণ।

অন্যান্য গুণের মতো এক্ষেত্রেও তিনি আদর্শ ছিলেন। এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না। কারণ, তিনি জানতেন, শত্রুর আক্রোশ থেকে মহান আল্লাহ তাকে অবশ্যই রক্ষা করবেন। আর যে-ব্যক্তি আল্লাহর ওপর এই মানের ভরসা করতে পারে, আল্লাহ তাকে সার্বিক নিরাপত্তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কুরআনে কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে—

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।[১]

[১] সূরা তালাক, আয়াত : ৩

সাহসিকতার ক্ষেত্রে তাকে সুদৃঢ় ও সুবিশাল পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। জীবনের সবচেয়ে সংকটপূর্ণ মুহূর্তেও তিনি অটল ও অবিচল ছিলেন। শত্রুর উদ্ধত হুমকি তাকে কখনো বিভ্রান্ত করতে পারেনি। শারীরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির ভয় তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। এমনকি প্রাণনাশের সমূহ আশঙ্কায়ও তিনি ভীত হননি। কারণ, রবের ওয়াদার ব্যাপারে তিনি ছিলেন পূর্ণ আশ্বস্ত। এব্যাপারে তার মনে কোনো সংশয় ছিল না। তাই রবের সমস্ত আদেশ তিনি খুশিমনে পালন করে গেছেন।

যুদ্ধের ময়দানে প্রাণনাশের আশঙ্কায় যেখানে অন্যরা এগোতে সাহস করত না, সেখানেও তিনি বীরদর্পে এগিয়ে যেতেন। রণক্ষেত্রে যখন তির-তরবারি মরণনেশায় মেতে উঠত, মুহূর্তেই লাশের স্তূপ জমে যেত তখনো তিনি নির্ভয়ে এগিয়ে যেতেন। সহযোদ্ধাদের উৎসাহ দিতেন। সুদীর্ঘ জীবনের কোনো যুদ্ধেই তিনি পলায়ন করেননি। এমনকি ভয়ে বা সংশয়ে এক পা পিছুও হটেননি।

অনেক সময় যুদ্ধক্ষেত্রে সাহাবীগণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ঢাল বানিয়ে নিতেন। কারণ, তারা জানতেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আশেপাশে থাকলে শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের জয় সময়ের ব্যাপার মাত্র। শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ও সামরিক প্রস্তুতি কখনোই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বিচলিত করতে পারেনি। তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, শত্রু যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, আল্লাহর ইচ্ছে ও কুদরতের মুকাবেলায় সে নিতান্ত দুর্বল। সুতরাং, তার ওপর ভরসা রাখলে যুদ্ধে বিজয় আসবেই।

হুনাইনের যুদ্ধে যখন মুসলিমবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে তখন ছয়জন সাহাবীকে সঙ্গে করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাই যুদ্ধ চালিয়ে যান। এ সময়ে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করে মহান আল্লাহ তাকে সাহস ও সান্ত্বনা দেন—

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ

আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন। আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের যিম্মাদার নন! তবে আপনি মুসলমানদের উৎসাহিত করতে থাকুন।[১]

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৮৪

এই উপর্যুপরি অভয় ও সাহসের কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের সময় ভয় পেতেন না। এমনকি দুশ্চিন্তাও করতেন না; বরং সব সময়ই তার মধ্যে স্বর্গীয় নিশ্চিন্ততা দেখা যেত। যুদ্ধের ময়দানে তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় কামনার পাশাপাশি নিজের শাহাদাতও কামনা করতেন। শাহাদাতের জন্য সর্বদা অধীর হয়ে থাকতেন। তাই ভয় বলে কিছুই তাকে ছুঁতে পারত না; কোনো যুদ্ধেই তার মধ্যে ভয় বা পিছুটান লক্ষ্য করা যেত না।

এই অসম সাহসিকতার কারণে অনেক সময় আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারাত্মক আঘাতের শিকার হয়েছেন। উহুদযুদ্ধে তিনি চেহারায় মারাত্মক আঘাত পেয়েছিলেন। সামনের দিকের একটি দাঁত পড়ে গিয়েছিল। সত্তরজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে এভাবে তিনি আঘাতের পর আঘাত সয়েছেন। কিন্তু কোনো দিন কাপুরুষতা প্রদর্শন করেননি। দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেননি এবং তার জন্য এটাই ছিল স্বাভাবিক। কেননা, তিনিই জিহাদ প্রবর্তন করেছেন। সুতরাং, চরম দুঃসময়ে অবিচল থেকে সহযোদ্ধাদের উৎসাহিত করা তার একান্ত কর্তব্য ছিল।

তিনি ভয়কে এমনভাবে জয় করেছিলেন যে, তার বীরত্ব ও যুদ্ধযাত্রা দেখলে মনে হতো শাহাদাতই তার একমাত্র কামনা।

খন্দক-যুদ্ধ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বীরত্ব ও অবিচলতার মহাকাব্য। সম্মিলিত শত্রুবাহিনী থেকে মুসলিমবাহিনীকে বেষ্টন করে ফেলেছে। পৃথিবী তার যোজন-যোজন ব্যাপ্তি সত্ত্বেও মদীনার মুসলিমদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। মুসলিমবাহিনীর হৃদয়ে মৃত্যুভয় চেপে বসেছে। প্রাণ কণ্ঠনালি অতিক্রম করার উপক্রম হয়েছে; কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখনো স্থির। শান্ত-সমাহিত। তার নির্ভিক চেহারা বলছিল, বিজয় সুনিশ্চিত।

তবে নিশ্চিন্ত হয়ে নির্বিকার বসে থাকা মুমিনের শান নয়। তাই তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে যান। আল্লাহকে ডাকতে থাকেন। তার কাছে সাহায্য চাইতে থাকেন। আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু শুরু হয়। কাফিরদের তাঁবু ও শিবির ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তৈজসপত্র সুদূর পাথারে উড়ে যায়। তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করে। মুসলিমদের বিজয়-ডঙ্কা বেজে ওঠে। কাফিররা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে।

বদরের যুদ্ধেও তিনি একই রকম আচরণ করেছেন। বিজয় নিশ্চিত জেনেও বিনিদ্র রজনী সালাতে ও প্রার্থনায় কাটিয়ে দিয়েছেন। তার আগে বা পরে অসম সাহস

ও স্রষ্টার ওপর অটুট নির্ভরতার সমন্বয় আর কারও মধ্যে ঘটেনি। তাই তো তিনি সারাটা জীবন বলে গেছেন—

“

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ

ওই সত্তার কসম—যার হাতে আমার প্রাণ, আমি আকাঙ্ক্ষা করি, যেন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হই, অতঃপর আবার জীবিত হই। আবার শহীদ হই। এরপর আবার জীবিত হই। (এভাবে শাহাদাত ও পুনর্জীবনের ধারা চলতেই থাকে)।[১]

[১] *সহীহ বুখারী* : ৩৬, ২৭৯৭; *সহীহ মুসলিম* : ১৮৭৬; হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

নবীজির আত্মত্যাগ

'যাহিদ' একটি আরবী শব্দ। অর্থ এমন ব্যক্তি—যে 'যুহদ' চর্চা করে। অর্থাৎ, যে দুনিয়ার আনন্দ ও মায়া-মোহ একমাত্র আল্লাহর জন্য ত্যাগ করে। 'যাহিদ' ব্যক্তি সব সময় দুনিয়াবি আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করে আখিরাতের সাফল্য-লাভের জন্য উদগ্রীব থাকে। এজন্য অনেকেই একে সুফিবাদের সাথে মিলিয়ে ফেলে—যা অনুচিত।

মূলত 'যুহদ' ঈমানের অনেক উঁচু একটি পর্যায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সকল যাহিদের ইমাম। 'দুনিয়া হচ্ছে একটি ভাসমান ঘর'—এই কথার ওপর ভিত্তি করেই তিনি 'যুহদ' করে গেছেন। দুনিয়ার সব আনন্দই ক্ষণস্থায়ী। জীবন কতটা দ্রুত বয়ে যায়, সেটা যারা বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়েছে, তাদের চেয়ে ভালো আর কেউ জানে না। অথচ এই সেদিনও তারা শিশু ছিল। তাই এই জীবনকে কখনোই আখিরাতের বিশাল জীবনের সাথে তুলনা করা চলে না। আর এজন্যই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আখিরাতের প্রতি তার লক্ষ্য স্থির রেখেছিলেন। আল্লাহর পুরস্কারের ব্যাপারে তিনি বেশ ভালোমতোই জানতেন। আল্লাহ অবশ্যই তার মুমিন বান্দাদের জন্য আনন্দ, স্বস্তি ও মহাপুরস্কারের ব্যবস্থা রেখেছেন। তাই দুনিয়ায় যা না হলেই নয়—এমন জিনিস ছাড়া আর কিছুর প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকৃষ্ট ছিলেন না।

'একজন ব্যক্তি যত বেশি দুনিয়াবি জিনিসের অধিকারী হবে, ততবেশি এই দুনিয়ার মায়াজালে আটকা পড়ে যাবে'—এ মহাসত্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্ট

কোনো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 'যুহদ' বা আত্মত্যাগ করেননি; বরং তিনি নিজের ইচ্ছেয় একজন 'যাহিদ' তথা আত্মত্যাগী ছিলেন। তিনি ছিলেন সমগ্র জাতির নেতা। তার চেয়েও বড় কথা, তিনি ছিলেন আল্লাহর সম্মানিত রাসূল। তিনি যদি ধন-দৌলত চাইতেন, তবে তার জন্য আল্লাহর কাছে একবার ফরিয়াদ করাই যথেষ্ট ছিল। চাইলেই তিনি পর্বতসম সোনা-রূপার মালিক হতে পারতেন। চাইলেই বিলাসবহুল জীবনের নিশ্চয়তা পেতেন; কিন্তু তার পরিবর্তে তিনি 'যুহদ' করাকে শ্রেয় মনে করেছেন। তার যা পাওয়ার, তিনি তা আখিরাতে গ্রহণ করতে চেয়েছেন।

এমন সিদ্ধান্তের কারণে কত রাত যে তাকে অনাহারে কাটাতে হয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। এমনও হয়েছে, দুই দিন, তিন দিন এমনকি এক মাসও চলে গেছে, কিন্তু তার চুলায় একবারও আগুন জ্বলেনি। সে-সময় হয় তিনি অনাহারে থেকেছেন; নয়তো কেবল খেজুর আর পানি পান করে দিনাতিপাত করেছেন।

একবার তার একজন স্ত্রী বলেছিলেন, এমন কখনো হয়নি যে, টানা তিন দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেট ভরে রুটি খেতে পেরেছেন। তিনি কখনো নরম গদিতে ঘুমাতেন না। হাতে বানানো খড়-কুটোর বিছানায় ঘুমাতেন। তার কোমল দেহে সেগুলোর দাগ পড়ে যেত। তবুও আরামদায়ক বিছানা গ্রহণ করতেন না।

এমনও সময় গেছে যখন ক্ষুধা নিবারণ করতে তাকে পেটে পাথর বেঁধে রাখতে হয়েছে। সাহাবীদের মধ্যে যারা অভাবে দিন যাপন করতেন, তারাও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই কষ্ট দেখে মুষড়ে পড়তেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘর ছিল মাটির তৈরি। এতে ইট, সিমেন্ট অথবা অন্যকোনো দীর্ঘস্থায়ী উপাদান ছিল না। ঘরটি ছিল নিতান্তই সাধারণ। ছোট, নিচু ও সংকীর্ণ। সাহাবীদের ওপর নির্ভর না করে একবার তিনি তার বর্মটি এক ইহুদীর কাছে ত্রিশ 'সা'[১] যবের বিনিময়ে বন্ধক রেখেছিলেন।

তার পোশাক ছিল অতি সাধারণ। আহারের জন্য কোনো দিনও আলাদা কোনো টেবিল ব্যবহার করেননি। সব সময় মেঝেতে বসে খেয়েছেন। সাহাবীগণ তার অভাবের কথা উপলব্ধি করে অনেক সময় তার নিকট খাবার পাঠাতেন।

---

[১] আরবের মরিমাপ-বিশেষ। প্রায় সাড়ে তিন সের।

উল্লেখ্য যে, তার এই অসামান্য ত্যাগ ও স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রতা বরণের উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার আবিলতা থেকে মুক্ত থাকা, স্রষ্টার প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা বজায় রাখা, স্বীয় বিশ্বাসে অটল থাকা এবং প্রতিশ্রুত পুরস্কারের জন্য নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করা। কেননা, মহান আল্লাহ তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন—

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।[১]

তার এই অনটনপূর্ণ জীবন দেখে এমনটি ভাবার সুযোগ নেই যে, তিনি কখনোই সচ্ছলতার মুখ দেখেননি অথবা তিনি চাইলেও সুখী-সচ্ছল জীবন-যাপন করতে পারতেন না। কারণ, তার কাছে বিভিন্ন সময়ে গনীমত, সাদাকা ও হাদিয়াস্বরূপ প্রচুর সম্পদ আসত। তিনি সেগুলো অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। দারিদ্র্যের ভয়ে অথবা বিলাসিতার আশায় একটি দিরহামও নিজের জন্য রাখতেন না।

অধিকন্তু কখনো যদি বুঝতে পারতেন, কারও হৃদয়ে ইসলামের প্রতি আগ্রহ আছে কিন্তু সে অর্থনৈতক সংকটের ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে পারছে না, তবে তিনি নিজের উট, গরু, মেষ—সবই ওই মানুষটিকে দিয়ে দিতেন। ইসলামের প্রতি তার আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, 'যদি আমার কাছে তিহামার বৃক্ষরাজি সমপরিমাণ সম্পদ থাকত, তাহলে আমি তা অকাতরে বিলিয়ে দিতাম। তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যেবাদী বা ভীরু ভাবার সুযোগ পেতে না।'[২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আখিরাতমুখিতা, দুনিয়াবিমুখতা এবং পার্থিব বিলাস-ব্যসনে অনাসক্তি যাহিদদের জন্য উত্তম আদর্শ হয়ে থাকবে। কারণ, বিলাসিতার সকল দরজা তার সামনে উন্মুক্ত ও অবারিত ছিল। জাতীয় কোষাগার তার অধীনে ছিল। তিনি চাইলে বৈধ উপায়ে সেখান থেকে সুবিধা গ্রহণ করতে পারতেন; এমনকি সাহাবীদের জীবনে তার অনস্বীকার্য অবদানের কথা উল্লেখ করে তাদের সমস্ত সম্পদও দাবি করতে পারতেন; কিন্তু তিনি এসবের কিছুই করেননি। নিজের জন্য কোনো প্রাসাদ বা অট্টালিকা নির্মাণ করেননি।

---

[১] সূরা দোহা, আয়াত : ৫

[২] *মুআত্তা* : ৯৭৭; *আল-আসওয়াত* : ১৮৬৪; *আল কামিল* : ৩/৯৭

বরং ইন্তেকালের সময় দেখা গেছে, তিনি পার্থিব কোনো সম্পদ রেখে যাননি। আর যেটুকু রেখে গেছেন, সেটুকুও দানের খাতায় চলে গেছে। কেননা, ইন্তেকালের পূর্বে তিনি বলে গেছেন—

“

لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

আমাদের[১] কোনো উত্তরাধিকার নেই; আমরা যা রেখে যাই তা সাদাকা।[২]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল একবার মুখ ফুটে চাইলেই সর্বকালের সেরা ধনী হয়ে যেতে পারতেন। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ তাকে রাজকীয় ও আড়ম্বর জীবন-যাপনের অফার দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি রাজকীয় জীবনের দিকে হাত না বাড়িয়ে অনাড়ম্বর বন্দেগীর জীবন বেছে নিয়েছিলেন। অথচ তিনি জানতেন, এই জীবনে একদিন খেতে পেলে আরেকদিন পাবেন না। মৃর্ত্যু পর্যন্ত তার এই অনটন ও দারিদ্র্য চলতেই থাকবে। তবুও তিনি স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ও অনটনপূর্ণ জীবন বেছে নিয়েছেন। সারাটা জীবন সংগ্রাম করে কাটিয়ে দিয়েছেন।

পার্থিব-জীবনের প্রতি অথবা ভোগ-বিলাসের প্রতি তার কোনো মায়া বা মোহ ছিল না। কাউকে দান করার আগে দ্বিতীয়বার ভাববার প্রয়োজনবোধ করতেন না। এজন্য দানের ব্যাপারে কেউ তার মুখ থেকে কখনো ‘না’ শোনেনি। কোনো দিন তার কাছে কিছু চেয়ে কাউকে খালি হাতে ফিরে যেতে হয়নি। কারণ, তার দৃষ্টিতে পার্থিব-জীবন এবং ভোগপোকরণ এতটাই তুচ্ছ ও মূল্যহীন ছিল যে, তিনি এগুলোকে সংরক্ষণেরও অনোপযোগী মনে করতেন। তাই দুনিয়ার ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেন—

“

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

যদি আল্লাহর কাছে এই দুনিয়ার মূল্য মশার একটি পাখার সমানও হতো তবে তিনি কোনো কফিরকে এক ঢোক পানি পান করতে পর্যন্ত দিতেন না।[৩]

---

[১] নবীদের

[২] *সহীহ বুখারী* : ৩০৯৩, ৩৭১২; *সহীহ মুসলিম* : ১৭৫৮

[৩] *জামি তিরমিযী* : ২৩২০।

"

كُنْ فِي الدُّنْيَا...أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

তুমি দুনিয়ায় মুসাফির হয়ে থাকো (কারণ সফরের সামান বেশি হলে যেমন সফর কষ্টদায়ক হয়, তেমনই দুনিয়ার ভোগোপকরণ বেশি হলেও আখিরাতের সফর কণ্টকাকীর্ণ হয়)।[১]

"

ازْهَدْ فِي الدُّنيا يُحِبَّكَ اللهُ ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ

তুমি দুনিয়ার ব্যাপারে নির্মোহ থাকো, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন। মানুষের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাক, মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।[২]

"

مَا لِي وَلِلدُّنْيَا ؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَ

আমার সাথে দুনিয়ার কোনো সম্পর্ক নেই! বস্তুত আমার এবং দুনিয়ার উপমা হচ্ছে ওই ব্যক্তির মতো যে দুপুরবেলা একটি গাছের ছায়ায় সামান্য বিশ্রাম নেয় অতঃপর ঘুম ভাঙলে সেখান থেকে চলে যায়। (আর কখনো সেখানে ফেরার ইচ্ছে করে না।)[৩]

"

الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلَّا ذِكْرَ اللهِ، وَمَا وَالَاهُ، أَوْ عَالِمًا، أَوْ مُتَعَلِّمًا

আল্লাহর যিকির, প্রিয় নেক আমল, ইলমের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী ব্যতীত দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত কিছু অভিশপ্ত।[৪]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬৪১৬; *জামি তিরমিযী* : ২৩৩৩; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪১১৪; *মুসনাদে আহমাদ* : ৪৭৫০, ৪৯৮২, ৬১২১।

[২] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪১০২; *আল কাবীর* : ১০৫২২; *মুসতাদরাক আল-হাকিম* : ৭৮৩৩, হাদীসটি সাহল ইবনু সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; *সিলসিলাতু আহাদীস আস-সাহীহা* : ৯৪৪।

[৩] *মুসনাদে আহমাদ* : ৩৭০১, ৪১৯৬; *জামি তিরমিযী* : ২৩৭৭; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪১০৯; হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম তিরিমিযী বলেছেন, 'হাদীসটি হাসান সহীহ।'

[৪] *জামি তিরমিযী* : ২৩২২; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪১১২; হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

“

وَهَل لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

তোমার সম্পদের কেবল ততটুকুই তোমার, যতটুকু তুমি খেয়ে নিঃশেষ করেছ অথবা পরিধান করে নষ্ট করে ফেলেছ কিংবা জীবদ্দশায় দান করে মৃত্যু-পরবর্তী সময়ের জন্য সংরক্ষণ করেছ।[১]

[১] সহীহ মুসলিম : ২৯৫৮

নবীজির বিনয়

প্রকৃতিগতভাবে যে নিরহঙ্কারী ও সাদাসিধে সে-ই মূলত বিনয়ী। নিজেকে সব সময় অবনমিত রাখা বিনয়ের পরিচয়-বৈশিষ্ট্য। আর এর ঠিক বিপরীত হলো ঔদ্ধত্য, গর্ব, অহঙ্কার।

মানুষ নানা কারণে বিনয়ের আশ্রয় নিয়ে থাকে। কেউ হীনম্মন্যতার কারণে; কেউ নিজেকে বিনয়ের মোড়কে উপস্থাপন করে বিশেষ সুবিধা গ্রহণের অভিপ্রায়ে; আবার কেউ বাস্তবিক অর্থেই ভালো ও সজ্জন ব্যক্তি হওয়ার সদিচ্ছায়। তবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিনয় ছিল সব ধরনের লৌকিকতামুক্ত। তার বিনয় ছিল সর্বশক্তিমান প্রভুর বিশালতার সামনে ভক্তিপ্রণোদিত হয়ে নতজানু থাকার বহিঃপ্রকাশ। তিনি মহান আল্লাহর শায়ানে শান[১] প্রশংসা করতেন। তার বড়ত্ব ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করতেন। জীবনের সকল কৃতিত্ব ও অর্জনকে মহান আল্লাহর হাতে সঁপে দিতেন। নিজেকে নিছক একজন প্রচারক ও বার্তাবাহক মনে করতেন।

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য অনুধাবন করেছিলেন বলেই তিনি জানতেন, মানুষ হয়ে অহমিকা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করতে যাওয়া কেবলই নির্বুদ্ধিতা। মানুষ যতই তাদের পদমর্যাদার গরিমা দেখাক না কেন, যতই টাকার পাহাড় বানাক না কেন, দুনিয়ার রাজা হয়ে যতই ক্ষমতার দাপট দেখাক না কেন—বাস্তবে এগুলো একেবারেই সামান্য। সূর্যের অপস্রিয়মাণ ছায়ামাত্র। আল্লাহর বিশাল সৃষ্টির

[১] যথোপযুক্ত

তুলনায় এগুলো অতি ক্ষুদ্র। একেবারেই নগণ্য। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পক্ষে আখিরাতের স্থায়িত্বের তুলনায় দুনিয়ার অস্থায়িত্বকে বেছে নেওয়া আদৌ সম্ভবপর ছিল না।

যে-সকল জিনিসের প্রতি সাধারণ মানুষ সব সময় লালায়িত থাকে সে-সবের প্রতি তার মোটেও আগ্রহ ছিল না। আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস তাকে এই নীচতা থেকে পবিত্র রেখেছিল। তিনি বিনম্র আচরণকে আরাধ্য মনে করতেন। এটাকেই সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তি বলে বিশ্বাস করতেন। আল্লাহর অনুগত দাস হিসেবে পরিচয় দিতে ভালোবাসতেন। মানুষ ও পশুপাখি তো বটেই; সৃষ্টির প্রতিটি সদস্যের প্রতি তিনি বিনম্র আচরণ করতেন।

অসুস্থদের দেখতে যেতেন। বৃদ্ধদের সাহায্য করতেন। গরীবদের দুঃখে ব্যথিত হতেন। অবহেলিত ও দুর্দশাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতেন। দুস্থের প্রতি গভীর সহানুভূতি পোষণ করতেন। ছোটদের সাথে খেলা করতেন। পরিবারের সাথে বিনোদন করতেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতেন। সবার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন।

মাটিতে বসতে দ্বিধা করতেন না। বালুর বিছানা ও খড়ের বালিশে ঘুমাতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আল্লাহর দয়া ও দানে পরিতুষ্ট থাকতেন। সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সুনাম সুখ্যাতির আশা করতেন না। অন্যের জন্যও এগুলোকে কল্যাণকর মনে করতেন না।

বলা হয় যে, একজন মানুষ তার অধীনদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করে—তার ওপর ভিত্তি করেই তার চরিত্র যাচাই করা যায়। এই বিচারেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সুমহান চরিত্রের অধিকারী। কারণ, তিনি সব সময় সাহাবীদের সাথে হাসিখুশি থাকতেন। কখনো কখনো হাস্যরসও করতেন। অসহায়-দুর্বলদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করতেন। নারীদের সম্মান করতেন। অন্যদেরও নারীদের সঙ্গে মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করার আদেশ দিতেন। অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করতেন। অপরিচিতদের সঙ্গেও সৌহার্দপূর্ণ ভাষায় কথা বলতেন এবং তার এই নিরহঙ্কার জীবন যাপনের রহস্য ব্যাখ্যা করে বলতেন, 'আমি আল্লাহর নগণ্য গোলামমাত্র। একজন গোলাম যেভাবে আহার করে আমিও ঠিক সেভাবেই আহার করি। একজন গোলাম যেভাবে উপবেসন করে আমিও ঠিক সেভাবেই উপবেসন করি।'[১]

---

[১] *আয-যুহদ* : ১/৬; *তাবাকাত* : ১/৩৭১; *কাশফ আল-খফা* : ১/১৭

একবার জনৈক ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখে শ্রদ্ধার আতিশয্যে কাঁপছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এই ভয়ার্ত চেহারা দেখে বলে ওঠেন—

> هَوِّنْ عَلَيْكَ، فَإِنِّي لَسْتُ بِمَلِكٍ، إِنَّمَا أَنَا ابْنُ امْرَأَةٍ تَأْكُلُ الْقَدِيدَ
>
> *শান্ত হও! আমি কোনো রাজা বাদশাহ নই। আমি তো সাধারণ এক মায়ের সন্তান। যে-মা অন্যান্য মায়ের মতো 'ক্বাদীদ'[১] খেয়ে বড় হয়েছেন।[২]*

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে কেউ তার প্রশংসা করলে তিনি তা পছন্দ করতেন না। তিনি বলেন—

> لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ ، فَقُولُوا : عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ
>
> *তোমরা আমার অতিশয় প্রশংসা করবে না, যেভাবে খ্রিস্টানরা ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম-এর প্রশংসা করত। আমি তো কেবল আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। তাই আমাকে শুধু আল্লাহর বান্দা ও রাসূল বলেই ডাকবে।[৩]*

একদা আমির ইবনু সা'সা'আ-এর প্রতিনিধিদল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে তাকে ভক্তি গদগদ হয়ে বলে—

> وَأَفْضَلُنَا فَضْلًا وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا
>
> *আপনি আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। আপনি আমাদের মান্যবর। মান্যবরের একমাত্র সন্তান।*

একথা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

---

[১] লবণ মাখানো শুকনো গোশত—এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন।

[২] *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৩১২; *মুসতাদরাক আল-হাকিম* : ৪৩৬৬, আবু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; *আল কামিল* : ৬/২৮৬

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৩৪৪৫

“

قُولُوا بِقَوْلِكُمْ ، أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ ، وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ

হে লোক সকল, তোমরা যা বলতে এসেছ, শুধু তাই বলো (আমার অনর্থক প্রশংসা কোরো না।) আর খেয়াল রেখো, শয়তান যেন কোনো দিন তোমাদের তার সাহায্যকারী ও অনুসারী না বানাতে পারে।[১]

আরেক দিনের ঘটনা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন মনে কাজ করছিলেন। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি এসে তার প্রশংসা করে বলেন—

“

مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ

যা আল্লাহ চান এবং যা আপনি চান, তাই হোক।

একথা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভীষণ ক্রুদ্ধ হন এবং তাকে ধমক দিয়ে বলেন—

“

أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ عَدْلًا ؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ

ধিক তোমাকে! তুমি তো আমাকে আল্লাহর সমতুল্য বানিয়ে ফেললে? বরং বলো, ‘যা একমাত্র আল্লাহ চান তা-ই হবে।[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্মানে উঠে দাঁড়ানোও ভীষণ অপছন্দ করতেন। কোনো মজলিসে বিশেষ জায়গায় বসার জন্য তিনি কাউকে উঠে যেতে বলতেন না; বরং যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই বসে পড়তেন। এমনকি যে-ব্যক্তি তার একটু আগে এসেছে, তিনি তারও পেছনে বসতেন। উঁচুদরের কোনো সভা-সমাবেশে না গিয়ে মুসলিম জনসাধারণের সঙ্গে থাকতে বেশি পছন্দ করতেন। অতি সাধারণ কেউ তাকে দাওয়াত দিলেও তিনি তার দাওয়াত কবুল করতেন এবং বলতেন—

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ* : ১৫৮৭৬; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৮০৬

[২] *মুসনাদে আহমাদ* : ১৮৪২, ২৫৫৭; *আস-সুনানুল কুবরা* : ১০৮২৫

“

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

আমাকে যদি (ভেড়ার) পায়ের নলা দিয়েও আপ্যায়ন করা হয় তবুও আমি তা গ্রহণ করব। আমাকে যদি (ভেড়ার) একটি হস্তও হাদিয়া দেওয়া হয়, তবুও আমি তা কবুল করব।[১]

গরীবদের প্রতি তার ভালোবাসা ছিল সীমাহীন। তিনি বলতেন—

“

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا ، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا ، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

হে আল্লাহ, আমাকে গরীব করে বাঁচিয়ে রাখো। গরীব হিসেবে মৃত্যু দিয়ো এবং পুনরুত্থান-দিবসে গরীবদের সাথেই উত্থিত কোরো।[২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনয়কে যেমন ভালোবাসতেন, অন্যদের বিনয়াবলম্বনের আদেশ করতেন আর তেমনই অহংকার ও ঔদ্ধত্যকে ঘৃণা করতেন; মানুষকে এগুলোতে জড়িয়ে যেতে নিষেধ করতেন এবং অহংকারের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে বলতেন—

“

يُحشَرُ المتَكَبِّرونَ يومَ القيامةِ أمثالَ الذَّرِّ في صُوَرِ الرِّجالِ يغشاهمُ الذُّلُّ من كلِّ مَكانٍ ، يُساقونَ إلى سجنٍ في جَهَنَّمَ يسمَّى بولُسَ تعلوهُم نارُ الأنْيارِ يَسقونَ من عُصارةِ أَهْلِ النَّارِ طينةَ الخبالِ

কিয়ামতের দিন ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীরা পিঁপড়ার আকারে পুনরুত্থিত হবে। অপমান তাদের চারপাশ থেকে চেপে ধরবে।[৩]

ঔদ্ধত্য বলতে সাধারণত আল্লাহর সম্মান, মাহাত্ম্য ও মহিমার সাথে প্রতিযোগিতা করাকে বোঝায়। এই সকল গুণাবলি কেবল আল্লাহরই। হাদীসে কুদসীতে এসেছে—

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ২৫৬৮, ৫১৭৮

[২] *জামি তিরমিযী* : ২৩৫২; হাদীসটি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪১২৬; *মুসতাদরাক আল-হাকিম* : ৭৯১১; হাদীসটি আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[৩] *জামি তিরমিযী* : ২৩৫২

"

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي ، وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي ، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا ، قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ

অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার পোশাক। অনন্তর এর যে-কোনো একটি নিয়ে আমার সাথে কাড়াকাড়ি করবে তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন বিনয় ও বিনম্রতার মূর্তপ্রতীক। সাধারণ মানুষ তো বটেই; দাস-দাসীদের ডাকেও তিনি সাড়া দিতেন। পথিমধ্যে কেউ তার হাত টেনে ধরলে, তিনি তার সাথে গমন করতেন। দাস-দাসীদের নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন। একারণে তার প্রতি ছিল সকল শ্রেণির মানুষের হৃদয়ছোঁয়া ভালোবাসা।

পৃথিবীর আর কোনো নেতা কি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মতো বিনয় দেখিয়েছেন? তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরিবারের সুবিধার কথা ভেবে সাধারণ গৃহস্থালি কাজ করতেও দ্বিধা করতেন না। নিজের জামা থেকে শুরু করে জুতা পর্যন্ত—নিজেই সেলাই করতেন। নিজেই ঘর মুছতেন, দুধ দোহাতেন, পরিবারকে মাংস কাটায় সহায়তা করতেন। কেউ এলে নিজেই আতিথেয়তা করতেন। কথা বলতেন এবং তাদের সাথে অত্যন্ত উদার ও মানবিক আচরণ করতেন।

সফরে বের হলে বাহন ও সহযাত্রীর প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখতেন। একবার তিনি সাওয়ার হতেন, আরেকবার তার সাথীকে সাওয়ার হতে দিতেন। দুজন একসাথে সাওয়ার হলে সঙ্গীর সুবিধার কথা ভেবে তিনি পেছনে বসতেন। কখনো আবার পশুর আরামের জন্য দুজনই পায়দল চলতেন। কাফেলায় একাধিক সহযাত্রী থাকলে তিনি সবার পেছনে থাকতেন। দুর্বল যাত্রীদের সাহায্য করতেন। তাদের নিরাপত্তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন এবং তাদের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে চলার গতি ও পথ নির্ধারণ করতেন।

সুতরাং, এই দয়ার আধার ও বিনয়ের মূর্ত প্রতীক মহান রাসূলের জন্য আমরা এই প্রার্থনা করতেই পারি—

> **হে আল্লাহ, যতদিন আমাদের মুখে তার নাম উচ্চারিত হবে, যতদিন তাকে নিয়ে মজলিস হবে আর যতদিন জিন-ইনসান তাকে স্মরণ করবে, ততদিন তুমি তার ওপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করো।**

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ২৬২০; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪০৯০

নবীজির সহনশীলতা

সহনশীলতা হলো ব্যক্তির মাঝে সংযম, কোমলতা, ধৈর্যশীলতা ও ক্ষমাশীলতার সম্মিলন। আভিধানিক দিক থেকে এর অর্থ দাঁড়ায়, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও প্রাপ্য কোনো কিছু গ্রহণ না করা।[১] তাই, যখন আমাদের সাথে কেউ খারাপ কিছু করে আর আমরা সুযোগ পেয়েও প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকি, তাকেই সহনশীলতা বলে।

সন্দেহাতীতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বাপেক্ষা সংযমী ও সহনশীল। কেউ তার সাথে দুর্ব্যবহার করলে তিনি ক্রুদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে তৎক্ষণাৎ তাকে ক্ষমা করে দিতেন। ব্যক্তিগত অধিকার ক্ষুণ্ণ হলেও তিনি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতেন। তবে আল্লাহর অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি অনমনীয় ও আপসহীন হয়ে উঠতেন।

হিজরত-পূর্বকালে স্বজাতির লোকেরা তাকে মিথ্যুক ও জাদুকর বলেছিল। তার প্রচার করা বাণীকে অস্বীকার করেছিল। তাকে কয়েক বছর আটকে রেখে নিগৃহীত করেছিল। আপন জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য করেছিল। এমনকি দীর্ঘসময় ধরে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিল। এতকিছুর পরও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। যাদের কারণে মক্কা ছেড়ে তাকে একদিন চলে যেতে হয়েছিল, মক্কা বিজয়ের দিন তাদের জন্যও তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বলেছেন, 'যাও, তোমরা মুক্ত'।[২]

---

[১] *Oxford Talking Dictionary*. Copyright 1998, The Learning Company, Inc. All Rights Reserved.

[২] *আল উম্ম* : ৭/৩৬১; *তারীখ* : ২/১৬১; *আস-সুনানুল কুবরা* : ১৮০৫৫; *সহীহ আল-জামি* : ৪৮১৫

সেদিন যখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নায়ক সুফিয়ান ইবনুল হারিস তার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে বলেছিল, 'আল্লাহর কসম, নিশ্চয় তিনি আমাদের মাঝে আপনাকেই নবী হিসেবে মনোনীত করেছেন, আর আমরা তো ছিলাম পরিষ্কার ভুলের মাঝে'—তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—

قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে অসংযত ও অপ্রীতিকর ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেদুঈনদের কুখ্যাতি ছিল; কিন্তু দুর্ব্যবহারের জবাব দুর্ব্যবহারের মাধ্যমে না দিয়ে তিনি তাদের ক্ষমা দিয়ে বরণ করে নিয়েছেন এবং কৃতার্থতার সঙ্গে মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত নির্দেশ পালন করেছেন—

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

অতএব, আপনি পরম সৌজন্যের সাথে তাদের ক্ষমা করুন।[২]

কিন্তু যখন আল্লাহর কোনো বিধান ভঙ্গ করা হতো তখন এই পরম সহিষ্ণু মানুষটিই হয়ে উঠতেন সবচেয়ে অসহিষ্ণু—ইস্পাত কঠিন। তবে ব্যক্তিগতভাবে কেউ তাকে ব্যঙ্গ করলে, অভিশাপ দিলে অথবা অন্যকোনো উপায়ে কষ্ট দিলে তিনি কখনোই ক্রুদ্ধ হতেন না। প্রতিশোধ গ্রহণের তো প্রশ্নই ওঠে না; বরং ক্ষমা ও সদাচারের চাদরে তাকে জড়িয়ে নিতেন। এমনকি যে-মুহূর্তে রেগে যাওয়াই স্বাভাবিক, সেই মুহূর্তে তিনি আরও বেশি সহনশীলতার পরিচয় দিতেন। এমনও হয়েছে, যে-লোক ক্ষতি করেছে তার দিকে ফিরেই তিনি হাসি উপহার দিয়েছেন। অধিকন্তু সহনশীলতার এই গুণ সবার মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তিনি জনৈক সাহাবীকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন—

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৯২

[২] সূরা হিজর, আয়াত : ৮৫

❝

ক্রুদ্ধ হয়ো না। কখনোই না। কখনোই না।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানতে পারতেন, তাকে নিয়ে কেউ ব্যঙ্গ করেছে অথবা অশোভন কিছু বলেছে তখনই তিনি সে-কথার ইতি টানতেন। কে কী বলেছে তা খোঁজ করতে যেতেন না। কোনোভাবে নিন্দুকের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে গেলেও তিনি তিরস্কার ও সমালোচনা থেকে বিরত থাকতেন। উপরন্তু কেউ তার বদনাম করে থাকলে সে-সংবাদ তার নিকট পৌঁছাতেও নিষেধ করতেন। বলতেন, 'আমার বিরুদ্ধে কেউ দোষারোপ করলে সেটা যেন কেউ আমাকে না জানায়। কারণ, আমি তোমাদের নিকট একটি পরিষ্কার ও নিষ্কলুষ মন নিয়ে উপস্থিত হতে ভালোবাসি।'[২]

একদিন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু নবীজিকে জনৈক নিন্দুকের নিন্দার কথা শোনালে তিনি ভীষণ বিরক্ত হন। তার পবিত্র চেহারায় বিরক্তির ছাপ ফুটে ওঠে। তিনি আক্ষেপ করে বলে ওঠেন, 'আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালাম-এর ওপর রহম করুন। তাকে তো আমার চেয়েও বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু তারপরও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন।'[৩]

ক্ষমা অনেক প্রকারের হতে পারে। অনেকে আছে যারা প্রতিশোধ নিতে অক্ষম, তাই ক্ষমা করে দেয়। আবার অনেকে আছে যাদের প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতা আছে কিন্তু সুযোগ নেই; তাই ক্ষমা করে দেয়। আবার কেউ কেউ আছে যাদের ক্ষমতা ও সুযোগ—উভয়টি থাকা সত্ত্বেও তারা ক্ষমা করে দেন। নিঃসন্দেহে এই শেষোক্ত ক্ষমা সবচেয়ে সুন্দর এবং অত্যন্ত বিরল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত এই প্রকারের ক্ষমাই করতেন। হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি যেদিন মক্কায় প্রবেশ করেন, সেদিন চাইলেই তার বিরুদ্ধে করা সমস্ত জুলুমের প্রতিশোধ নিতে পারতেন। সেদিন তার বাহিনীর প্রতিটি সৈন্য কেবল তার আদেশের অপেক্ষা করছিল; কিন্তু তা না করে তিনি ক্ষমার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন—যা আজও

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬১১৬

[২] *মুসনাদে আহমাদ* : ৩৭৫০; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪৮৬০; *জামি তিরমিযী* : ৩৮৯৬; হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৩১৫০, ৩৪০৫; *সহীহ মুসলিম* : ১০৬২

ইতিহাস হয়ে আছে। তিনি বলেন—

"

وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ

কেউ যদি তার ক্রোধ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহও তাকে শাস্তি দেওয়া থেকে বিরত থাকবেন।[১]

একদা গনীমতের মাল বণ্টন প্রসঙ্গে এক ব্যক্তি তাকে বলেছিল, 'ইনসাফ করুন'। একথা শুনে ইনসাফের মূর্তপ্রতীক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটুও ক্রুদ্ধ হননি। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে তাকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিতও করেননি। কেবল এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন—

"

قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ

যদি আমি ইনসাফ না করি, তবে (আখিরাতে তো) আমিই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবো।[২]

একবার জনৈক ইহুদী তার সাথে খুবই দুর্ব্যবহার করে; তার সাথে অত্যন্ত আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলে। তবুও তিনি তাকে মাফ করে দেন। তার এই সহনশীলতাই ছিল শত্রুদের হৃদয়ের অগ্নি নির্বাপক। মহান আল্লাহ বলেন—

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

মন্দের জবাবে তাই বলুন, যা উত্তম। তারা যা বলে, আমি সে-বিষয়ে সবিশেষ অবগত।[৩]

[১] *আবু ইয়ালা* : ৪৩৩৮; *আশ-শুআব আল-ইমান* : ১৯১৯; *মাজমুআয যাওয়াইদ* : ১০/২৯৮

[২] *সহীহ বুখারী* : ৩১৩৮; *সহীহ মুসলিম* : ১০৬৩

[৩]সূরা মুমিনূন, আয়াত : ৯৬

কারও সহনশীলতার সবচেয়ে বড় পরিচয় পাওয়া যায় তার পরিবার ও অধীন লোকদের সাথে তার আচরণের মাধ্যমে। কারণ, লোক-সমাজে যখন কেউ ভুল করে, সেটাকে সবাই ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতেই দেখার চেষ্টা করে। কেউ-ই সমাজের সামনে উগ্র ভাবমূর্তি ধারণ করতে চায় না; কিন্তু ঘরের চার দেওয়ালের ভেতর রাগ প্রকাশ করা অনেক সহজ। তাতে সমাজে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কা থাকে না; বরং তা গোপন থাকে। আবার অধীন কারও ওপরও রাগ ঝাড়া অনেক সহজ। এতে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না। সহনশীলতা নিরূপণের এই মানদণ্ডেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ ছিলেন।

তিনি পরিবার এবং অধীন সকলের প্রতি ছিলেন সহনশীল। আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিদমতে দশ বছর নিযুক্ত ছিলাম। এই দীর্ঘসময়ে একবারও কোনো কাজের জন্য তার জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হইনি—'এটা কেন করেছ? সেটা কেন করোনি'—এজাতীয় প্রশ্ন করে কখনো আমাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেননি।'[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সংস্পর্শে আসা সব মানুষই তার সদা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, মিশুক প্রকৃতি, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ এবং ক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখে অভিভূত হয়ে যেত। তাদের বিস্ময় খুব দ্রুতই সমীহে পরিণত হতো। সেখান থেকে জন্ম নিত অদ্ভুত ও অপার্থিব ভালোবাসা। এভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়ে উঠতেন তাদের প্রাণপুরুষ। মাথার মুকুট।

[১] *সহীহ বুখারী* : ৫৬৯১; *সহীহ মুসলিম* : ২৩০৯

নবীজির দয়া

মহামহিম আল্লাহ তার প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দয়া-গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।[১]

একটি হাদীসে এসেছে—

إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ

আমি মহান আল্লাহর দয়া বিশেষ এবং তার দিকে পথপ্রদর্শক।[২]

একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার এক দৌহিত্রকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে কেঁদে ফেলেন। উপস্থিত সাহাবীদের কাছে তার এই ক্রন্দন অস্বাভাবিক মনে হয়। জনৈক সাহাবী ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি দুচোখে গড়ানো অশ্রু

[১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭

[২] *সুনানুদ দারিমী* : ১৫; সনদ : মুরসাল; *মুসতাদরাক আল-হাকীম*, একই হাদীস অন্য বর্ণনায় সহীহ সনদে এসেছে আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে।

দেখিয়ে বলেন—

"

إِنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

এটা মানুষকে দেওয়া মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ বিশেষ। তিনি তার বান্দাদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছে করেন, কেবল তার হৃদয়ে এই দয়ার উদ্রেক করেন। অধিকন্তু মহান আল্লাহ কেবল দয়াশীলদের প্রতিই দয়া করেন।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন এমনকি অপরিচিতদের সাথেও দয়াপূর্ণ আচরণ করতেন। তার দয়া নির্দিষ্ট কোনো গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি এসেছিলেন গোটা মানবজাতির জন্য অনুগ্রহ হয়ে।

সব ক্ষেত্রে তিনি মানুষের সুবিধার স্বার্থে কাজ করে গেছেন। জামাআতে সালাত আদায়ের সময় যদি কোনো শিশুর কান্নার আওয়াজ পেলে শিশুটির মায়ের কষ্টের কথা ভেবে সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন। অথচ স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি সালাত দীর্ঘ করতে ভালোবাসতেন। একবার তার দৌহিত্রী শিশু-উমামাহ বিনতে যাইনাব রাযিয়াল্লাহু আনহা সালাতের সময় কেঁদে ওঠে। সাথে সাথে তিনি উমামাকে কোলে তুলে নেন এবং যথারীতি সালাতের ইমামতি চালিয়ে যান।[২] সিজদার সময় হলে তাকে একপাশে রেখে সিজদায় যান। আবার সালাতে দাঁড়ানোর সময় তাকে কোলে তুলে নেন।'[৩]

আরেক দিনের ঘটনা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিজদায় চলে গিয়েছেন। এমন সময়ে তার প্রাণের টুকরা হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু তার পিঠে চড়ে বসেন। নাতির মনোরঞ্জনের জন্য তিনি সিজদা দীর্ঘ করেন এবং সালাত শেষে সবার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন—

"

ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ

[১] *সহীহ বুখারী* : ১২৮৪, ৬৬৫৫, *সহীহ মুসলিম* : ৯২৩

[২] এটি ওই সময়ের হাদীস, যখন সালাতে পার্থিব ক্রিয়াকলাপ জায়িয ছিল এবং জামাআতের সালাতে নারীদের অংশ গ্রহণের সাধারণ অনুমতি ছিল।

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৫১৬; *সহীহ মুসলিম* : ৫৪৩, হাদীসটি আবু কাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

এই শিশুটি আমার পিঠে চড়ে বসেছিল। স্বেচ্ছায় সে নিচে নামা পর্যন্ত সিজদা থেকে উঠতে মন সায় দেয়নি।[১]

উল্লেখ্য যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল নিজে দয়া-গুণের চর্চা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তার সাহাবীদেরও এই গুণ অর্জন ও চর্চার নির্দেশ দিয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، وَالضَّعِيفَ، وَذَا الْحَاجَةِ

যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ইমামতি করে তখন সে যেন তার সালাত সংক্ষিপ্ত করে; কারণ, সেখানে অনেক অসুস্থ, দুর্বল ও প্রয়োজন-তাড়িত ব্যক্তিও থাকে।[২]

একবার মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু লম্বা সময় নিয়ে সালাত পড়ান। তার এক ব্যস্ত মুসল্লী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট গিয়ে অভিযোগ করেন। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআযকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

“

يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ ؟

হে মুআয, তুমি কি ‘ফাত্তান’?[৩]

ফাত্তান বলা হয় ওই ব্যক্তিকে—যে অন্যদের কষ্টে ফেলে, পরীক্ষায় নিপতিত করে অথবা কর্তব্যকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সালাত দীর্ঘ করায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ফাত্তান বলে তিরস্কার করেছেন এ কারণে যে, দীর্ঘ সালাতের ফলে অনেকে জামাআতে সালাত আদায় থেকে বিমুখ হয়ে যেতে পারে। এই দিকে লক্ষ্য করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক ক্ষেত্রেই

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ* : ২৭১০০, সুনানুন নাসায়ী : ১১৪১

[২] *সহীহ বুখারী* : ৭০৩; *সহীহ মুসলিম* : ৪৬৮; হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৭০৫, ৬১০৬; *সহীহ মুসলিম* : ৪৬৫; হাদীসটি জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

মানুষকে ছাড় দিতেন। নিজের প্রচণ্ড আগ্রহ সত্ত্বেও সালাত সংক্ষিপ্ত করতেন। কারণ, তিনি কোনো কিছুই মানুষের জন্য কঠিন করে ফেলতে চাননি। তিনি বলেন—

“

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

যদি মানুষের জন্য কঠিন না হয়ে যেত, তবে প্রতি ওয়াক্তের সালাতের আগে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।[১]

ইবাদাতের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি মূলনীতিও বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

“

وَالقَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا

ধৈর্য ধরো, মধ্যপন্থা অবলম্বন করো তবেই তোমরা মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে।[২]

তিনি আরও বলেন—

“

إِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

আমাকে সত্য, উদার ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-বিধান দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।[৩]

অর্থাৎ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এমন একটি দ্বীন ও জীবন-বিধান দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যে-দ্বীন মিথ্যেকে অস্বীকার করে, মহান আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করে এবং সকল ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ আমল ও বিধান প্রণয়ন করে।

অপর এক হাদীসে এসেছে—

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৮৮৭; *সহীহ মুসলিম* : ২৫২, হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] *সহীহ বুখারী* : ৬৪৬৩; হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[৩] *মুসনাদে আহমাদ* : ২১৭৮৮; হাদীসটি আবু উমামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

"

إِنَّ خَيْرَ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ ،

দ্বীনের মধ্যে যা পালনে সহজ তা-ই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম।[১]

আরও বলা হয়েছে—

"

عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا

তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো।[২]

অন্য একটি হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

"

عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا

তোমরা ওই কাজটিই করো, যা ক্লান্তিহীনভাবে করতে পারবে। কারণ, আল্লাহ প্রতিদান দিতে গিয়ে ক্লান্ত হবেন না; বরং তোমরাই ইবাদাত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে।[৩]

অবশ্যই 'ক্লান্তি' আল্লাহকে ছুঁতে পারে না। তাই এটাকে এভাবে বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ এমন সত্তা নন, যিনি আমাদের দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে যাবেন; বরং আমরা যতক্ষণ ভালো কাজ করতে থাকব, তিনিও আমাদের ক্লান্তিহীনভাবে পুরস্কার দিতে থাকবেন। কাজেই এমন ইবাদাত করা উচিত—যাতে অল্পেই ক্লান্তি চলে না আসে বরং সব সময়ই পালন করা যায়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দয়া-গুণের মহৎ একটি দিক এই যে, তাকে সহজ ও কঠিন দুটি বিষয়ের কোনো একটি নির্বাচনের ইচ্ছাধিকার দেওয়া হলে তিনি সাধারণ মানুষের সুবিধার দিকে লক্ষ্য করে অপেক্ষাকৃত সহজটি গ্রহণ করতেন।

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ* : ১৫৫০৬; *মাজমাউয যাওয়াইদ* : ৩/৩০৮

[২] *মুসনাদে আহমাদ* : ২২৪৫৪, ২২৫৪৪; *আস-সুনানুল কুবরা* : ৪৫১৯; *আল-বায়ান ওয়াত তারিফ* : ২/১০৯

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৫৮৬২; *সহীহ মুসলিম* : ৭৮২, হাদীসটি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

একবার তিন ব্যক্তি এই ভেবে নিজেদের ওপর কঠোর ইবাদাত চাপিয়ে নিয়েছিল যে, মহান আল্লাহ তার রাসূলের পূর্বাপরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। কাজেই তিনি কখনো ইবাদাত করেন; আবার কখনো বিশ্রাম নেন; কিন্তু তিনি ব্যতীত অন্যকারও সমস্ত গুনাহ মাফ করা হয়নি। ভবিষ্যতে মাফ হবে কি না—তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই তারা নিজেদের ওপর সাধ্যাতীত ইবাদাত চাপিয়ে নেয়। তাদের একজন তো শপথ-ই করে ফেলে যে, বাকি জীবনের প্রতিটি রাত সে না-ঘুমিয়ে ইবাদাতে কাটিয়ে দেবে। আরেকজন প্রতিদিন সিয়াম রাখার ব্রত নেয়। আর তৃতীয়জন কখনো বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেয়।

তাদের এই অযৌক্তিক সংকল্প ও অভিপ্রায়ের কথা জানতে পেরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

أَما واللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ وَأَتْقَاكُم لَهُ لكِنِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأُصلِّي وَأَرْقُد ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فمنْ رغِب عَنْ سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي

আল্লার শপথ, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং আমি তোমাদের চেয়ে বড় মুত্তাকি। তারপরও আমি রাতের কিছু অংশ ঘুমাই আর কিছু অংশ সালাত আদায় করি। কোনো দিন রোযা রাখি আবার কোনো দিন রাখি না। কেউ যদি আমার এই আদর্শ ত্যাগ করে, তবে সে আমার অনুসারী বলে বিবেচিত হবে না।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালো করেই জানতেন যে, সফর সব সময়ই কষ্টদায়ক। কারণ, সফরের প্রয়োজনে মুসাফিরকে দীর্ঘদিন ঘর ছেড়ে দূরে থাকতে হয়। নতুন পরিবেশে ঘুমের অসুবিধা হয়। রৌদ্রের তাপ ও পথের কষ্ট সহ্য করে যাত্রা অব্যাহত রাখতে হয়। তাই সফরের কষ্ট লাঘব করার জন্য তিনি বেশ কিছু নিয়ম প্রবর্তন করেন। রামাদান মাসে সফরের সময় মাঝে মাঝে সিয়াম পালন থেকে বিরত থাকেন। সফরে চার রাকাত সালাতকে সংক্ষিপ্ত করে দুই রাকাত পড়েন। (হজের সময়ে) যোহর ও আসর এবং মাগরীব ও ইশা একত্রে পড়েন। অতিবৃষ্টির সময়ে মুআযযিনকে এই বলে ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ করেন যে, ‘তোমরা যার যার ঘরে সালাত পড়ে নাও’।

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৫০৬৩; *সহীহ মুসলিম* : ১৪০১, হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোমলতা ও মধ্যপন্থার এই অনন্য সাধারণ গুণগুলো শুধু নিজে ধারণ করাই যথেষ্ট মনে করেননি; বরং তার সাহাবী ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এই সকল গুণ ধারণ ও চর্চার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। সেই সঙ্গে কঠোরতা আরোপকারীদের সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন—

“

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

কঠোরতাকারীরা ধ্বংস হোক।[১]

“

إِنَّ الرِّفْقَ لا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

যখন কোনো কিছুর সাথে কোমলতা যুক্ত হয়, তখন তা অলঙ্কৃত হয়। আর যখন কোমলতা সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন তা কলঙ্কিত ও দূষিত হয়ে যায়।[২]

একদা আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনি আস রাযিয়াল্লাহু আনহু নিজের ওপর ইবাদাতের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে নিলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন—

“

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ

সাবধান! মাত্রা ছাড়িয়ে যেয়ো না।[৩]

“

أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ

আমরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বিশেষ জাতি।[৪]

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ২৬৭০

[২] *সহীহ মুসলিম* : ২৫৯৪, হাদীসটি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[৩] *মুসনাদে আহমাদ* : ১৮৫৪, ৩২৩৮; *সুনানু নাসায়ী* : ৩০৫৭; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩০২৯; *আস-সুন্নাহ* : ১/৪৬, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আবি আসিম এর সনদ সহীহ বলেছেন।

[৪] *মুসনাদে আহমাদ* : ১৯১৭৯, ১৯২৫৩; *সুনানু আবি দাউদ* : ৪২৭৮, *মুসতাদরাক আল-হাকিম* :

“

وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

আমি তোমাদের কোনো আদেশ করলে, তোমরা যথাসম্ভব তা পালন করবে।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই সহজায়ন প্রচেষ্টা মূলত মহান আল্লাহর নির্দেশেরই বাস্তবায়ন। কেননা, মহান আল্লাহ তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ

আর আমি আপনার জন্য সুগম করে দেবো সহজ পথ। অর্থাৎ, আমি আপনার জন্য শরীয়ত সহজতর করে দেবো।[২]

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না।[৩]

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

অতএব, তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করো।[৪]

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না।[৫]

৮৩৭২, হাদীসটি আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সনদ : সহীহ।

[১] *সহীহ বুখারী* : ৭২৮৮; *সহীহ মুসলিম* : ১৩৩৭; হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] সূরা আলা, আয়াত : ৮

[৩] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮৬

[৪] সূরা তাগাবুন, আয়াত : ১৬

[৫] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৫

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি।[১]

[১] সূরা হজ, আয়াত : ৭৮

আল্লাহর স্মরণ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সারাটা জীবনই আল্লাহর স্মরণে কেটেছে। ইসলামের দাওয়াত, উপদেশ প্রদান, জিহাদ, ইবাদাত এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে তিনি আল্লাহকে স্মরণ করেছেন। ঘরে-বাইরে, সকাল-সন্ধ্যা—সব সময় তাকে ডেকেছেন; প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসে তার যিকির করেছেন। এমনকি নিদ্রা ও বিশ্রামও তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। চোখের পাতা বন্ধ হলেও রবের প্রতি ভালোবাসায় তার হৃদয় জাগ্রত থাকত। এই অন্তহীন প্রভুপ্রেমের অপার্থিব একটি জ্যোতি তার চোখে-মুখে ও সর্বসত্তায় খেলা করত। তাই তাকে দেখামাত্রই আল্লাহর কথা স্মরণ হতো।

অধিকন্তু তিনি কথায় ও আচরণে সাধারণ মানুষকেও আল্লাহর যিকির ও স্মরণে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি বলতেন—'যারা মুফাররাদুন তারা অগ্রবর্তী।' সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'মুফাররাদুন' কারা? তিনি বললেন, 'মুফাররাদুন হলো সেইসব নারী-পুরুষ—যারা অষ্টপ্রহর আল্লাহকে স্মরণ করে।'[১]

অপর এক বর্ণনায় আছে—

"

مَثَلُ الذى يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِى لا يَذْكُرُ رَبَّهُ ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

[১] *সহীহ মুসলিম* : ২৬৭৬, হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

যে-ব্যক্তি তার রবকে স্মরণ করে, আর যে-ব্যক্তি করে না, তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়।[১]

একবার এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপদেশ চাইলে তিনি বলেন—

"

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

তোমার জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর স্মরণে সিক্ত রাখবে।[২]

যে যত বেশি আল্লাহকে স্মরণ করবে মুসলিম হিসেবে সে তত বেশি সম্মানের অধিকারী হবে। হাদীসে কুদসীতে আছে—

"

أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ

আমি ততক্ষণ আমার বান্দার সাথে থাকি, যতক্ষণ সে আমাকে স্মরণ করে এবং (আমার স্মরণে) তার ঠোঁট নড়তে থাকে।[৩]

হাদীসে কুদসীতে আরও এসেছে—

"

فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي ، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلإٍ ، ذَكَرْتُهُ فِي مَلإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ

কেউ যদি আমাকে নিভৃতে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে নিভৃতে স্মরণ করি। আর কেউ যদি আমাকে লোকদের মজলিসে স্মরণ করে, তবে আমি তাকে তাদের চেয়েও উত্তম মজলিসে স্মরণ করি।[৪]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬৪০৭; *সহীহ মুসলিম* : ৭৭৯, হাদীসটি আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] *মুসনাদে আহমাদ* : ১৭২২৭, ১৭২৪৫; *জামি তিরমিযী* : ৩৩৭৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৭৯৩; মিশকাত আল মাসাবীহ : ২২৭৯

[৩] *সহীহ বুখারী*-তে একে 'মুআল্লাক' বলা হয়েছে; *মুসনাদে আহমাদ* : ১০৫৮৫, ১০৫৯২; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৭৯২; হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[৪] *সহীহ বুখারী* : ৭৪০৫; *সহীহ মুসলিম* : ২৬৭৫, হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে

এছাড়া আরও অসংখ্য বর্ণনা আছে, যেখানে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন দুআ ও যিকিরের মাধ্যমে মুসলিমদের আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকার আহ্বান করেছেন। এ স্মরণ হতে পারে তাওহীদের বাণী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' ঘোষণার মাধ্যমে, কিংবা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে 'সুবহানাল্লাহ', তার প্রশংসায় মগ্ন থেকে 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং তার বড়ত্বের কথা চিন্তা করে 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণের মাধ্যমে।

এছাড়াও তার ক্ষমতার ব্যাপ্তি বর্ণনা করে 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পড়া, নিজের গুনাহের জন্য মাফ চেয়ে 'আসতাগফিরুল্লাহ' পড়া এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করাও আল্লাহর স্মরণের অন্তর্ভুক্ত।

সত্যি বলতে এ বিষয়ে চাইলেই একটি কিতাব লিখে ফেলা সম্ভব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আল্লাহকে স্মরণ করতে বলে গেছেন। কীভাবে তাকে স্মরণ করতে হবে, বিশেষ বিশেষ সময়ে কী বলতে হবে, সকাল-সন্ধ্যা কীভাবে আল্লাহকে ডাকতে হবে, তাকে স্মরণ করার সুফল ও পুরস্কার কী হবে?—সব কিছুই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে গেছেন।

অন্যকে আল্লাহর স্মরণের গুরুত্ব বোঝানোর আগে তিনি নিজেই সর্বাবস্থায় তাকে স্মরণ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আল্লাহর স্মরণে তার হৃদয় ছিল সদা জাগ্রত। শ্রদ্ধাবনত। তিনি নিবিষ্ট-চিত্তে তার রবকে ডাকতেন। তার কোমল হৃদয় ছিল আশা ও ভালোবাসায় সিক্ত। আর সে-হৃদয় কেবল তার রবের সন্তুষ্টির মোহেই আচ্ছন্ন হয়ে থাকত।

বর্ণিত হয়েছে।

নবীজির প্রার্থনা

দুআ সম্পর্কে কিছু বলার আগে পাঠকের দুআ, সালাত এবং ইবাদাতের মধ্যকার মিল ও অমিলগুলোর ব্যাপারে ধারণা থাকা প্রয়োজন। যেমন, সালাত হলো ইবাদাতের একটি সুনির্দিষ্ট বিধান—যেখানে তাকবীরে তাহরীমা বলতে হয়, রুকুতে যেতে হয়, সিজদা করতে হয়। সালাতের মধ্যেই রয়েছে কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর বিশালতার স্মরণ, তাঁর প্রশংসা এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দরূদ পাঠ। এটা ইবাদাতের বিশেষ একটি মাধ্যম।

পক্ষান্তরে দুআ হচ্ছে আল্লাহর নিকট সরাসরি চাওয়ার একটি সাধারণ মাধ্যম। দুআর ভেতর আল্লাহর কাছে সাহায্য, সমৃদ্ধি, পুরস্কার, জান্নাত, হিদায়াত—সব কিছু চাওয়া হয় এবং যে-কোনো সময় এটা করা যায়।

আর ইবাদাত বলতে যে-কোনো ধরনের 'উপাসনা' বোঝানো হয়। নিয়ত সঠিক থাকলে প্রতিটি কাজই ইবাদাত হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। কাজেই সালাত একটি ইবাদাত হলেও কেবল সালাতের ভেতরেই ইবাদাতের ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ নয়। সালাত যেমন ইবাদাত তেমনই দুআও। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

"

الدُّعاءُ هو العبادةُ

দুআ হলো ইবাদাত।[১]

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ* : ১৭৮৮৮, ১৭৯১৯; *সুনানু আবি দাউদ* : ১৪৭৯; *জামি তিরমিযী* : ২৯৬৯,

প্রার্থনা-বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো।[১]

অন্যত্র বলেন করেন—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

আর আমার বান্দারা যখন আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে, বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা কবুল করি—যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে।[২]

মহান আল্লাহ এবং মানুষের মধ্যে বড় একটি পার্থক্য হলো, মানুষের কাছে চাইলে মানুষ অখুশি হয়। অনেক সময় চক্ষুলজ্জা বা অন্যকোনো কারণে সাহায্যও করে; কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে তারা বিরক্ত হয়। অন্যরা তাদের উদারতার সুযোগ নিচ্ছে ভেবে ক্রুদ্ধ হয়; কিন্তু মহান আল্লাহ এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি না চাইলে অখুশি হন। তার কাছে যত বেশি চাওয়া হয় তিনি তত বেশি খুশি হন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ

যদি কেউ আল্লাহর কাছে না চায়, তবে আল্লাহ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন।[৩]

৩২৪৭; হাদীসটি নুমান ইবনু বশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; সনদ : সহীহ।

[১] সূরা মুমিনূন, আয়াত : ৬০

[২] সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৬

[৩] *আল আদাবুল মুফরাদ* : ৬৫৮; *জামি তিরমিযী* : ৩৩৭৩, হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ ছাড়া কারও ওপর ভরসা করতেন না। আল্লাহই ছিল তার একমাত্র ভরসা। যে-কোনো সময়, যে-কোনো প্রয়োজনে তিনি কেবল তার রবকেই ডাকতেন। নিবেদিতপ্রাণ হয়ে তার কাছে প্রার্থনা করতেন। প্রয়োজন দেখা দিলে প্রার্থনা করতে কালবিলম্ব করতেন না। তবে তিনি সাধারণ প্রার্থনায় ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত দুআ করতেন। তার এই সকল দুআ হতো সারগর্ভ ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন তিনি প্রায়শই তার দুআয় বলতেন—

“

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

হে আমাদের প্রভু, এই দুনিয়াতে যা-কিছু মঙ্গল তা আমাদের দিন এবং আখিরাতের জন্য যা কল্যাণকর তা-ও আমাদের দিন। আর জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের রক্ষা করুন।[১]

এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ দুআ আর কী হতে পারে?

অবশ্য কোনো কোনো দুআয় তিনি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের জন্যও প্রার্থনা করতেন। ক্ষমা ও নিরাপত্তা চেয়ে একটি দুআয় তিনি প্রায়শই বলতেন—

“

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই।[২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি বিষয়ের জন্য সাধারণত তিনবার করে দুআ করতেন। প্রয়োজন হলে ওযূ করে পাক-পবিত্র হয়ে নিতেন। কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করতেন। এরপর দুআ শুরু করতেন। তিনি দুআর এই সকল আদব সাহাবীদেরও শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন—সম্ভব হলে দুআর পূর্বে ওযূ করা, দুআ শুরু করার পূর্বে আল্লাহর প্রশংসা করা। রাসূলের ওপর দরূদ পাঠ করা। দুআর মধ্যে আল্লাহকে তার গুণবাচক নামে ডাকা। প্রয়োজনের বিষয়টি নিবেদিত-চিত্তে

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৪৫২২, ৬৩৮৯; *সহীহ মুসলিম* : ২৬৮৮, হাদীসটি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] *মুসনাদে আহমাদ* : ৪৭৭০; *সুনানু আবি দাউদ* : ৫০৭৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৮৭১; *মুসতাদরাক আল-হাকিম* : ১৯০২; হাদীসটি উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

প্রার্থনা করা। প্রার্থনা কবুলের ব্যাপারে আস্থাশীল থাকা। মনের চৌহদ্দিতে অধৈর্য ও হতাশাকে স্থান না দেওয়া। অনবরত দুআ করতে থাকা এবং হামদ ও সালাতের মাধ্যমে দুআ শেষ করা।

দুআর আদব শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তিনি দুআ কবুলের বিশেষ কিছু সময়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন—সালাতের পরে, আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে, জুমআর দিনের শেষভাগে, আরাফাতের দিনে, সিয়াম পালনরত অবস্থায়, সিজদারত অবস্থায় এবং মুসাফির থাকাকালীন সময়ে দুআ করা হলে আল্লাহ সে দুআ কবুল করে থাকেন। এছাড়াও পিতা-পুত্রের পারস্পরিক দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারেও সমূহ সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময়ই আল্লাহকে ডাকতেন। তার কাছে প্রার্থনা করতেন। তবে বিপদের মুহূর্তে তার দুআয় আন্তরিকতা ও আত্মনিবেদন বহুগুণে বেড়ে যেত। যখনই তিনি সংকটে পড়তেন, তখনই আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন—সন্ত্রস্ত, বিনীত ও অনুগত হয়ে। আল্লাহর প্রতি ছিল তার অগাধ বিশ্বাস। বদর, খন্দক ও আরাফাতের দিনে আল্লাহ তার দুআ কবুল করেছেন। অনাবৃষ্টির কারণে একবার মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে হাত তোলেন, অমনি মুষলধারে বৃষ্টি নামতে শুরু করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বচক্ষে দুআ কবুলের অভাবনীয় দৃশ্য দেখেছেন। তিনি দেখেছেন প্রার্থনা করামাত্রই সুদূর আকাশের চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার অভূতপূর্ব দৃশ্য।

প্রার্থনার মাধ্যমে তিনি মহান আল্লাহর বিশেষ নৈকট্য লাভ করেছিলেন। ফলস্বরূপ আল্লাহও তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করেছিলেন। জিহাদের ময়দানে তার জন্য সরাসরি সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। মুসলিমদের জয়ী করে কাফিরদের অপদস্থ করেছিলেন। এভাবেই মহান আল্লাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুআ কবুল করেছেন এবং দ্বীন ও একাত্মবাদের প্রতিষ্ঠায় তাকে সাহায্য করেছেন।

নবীজির লক্ষ্য

উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতে হলে নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে হয়। তবে 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা' শব্দটিকে সাধারণত ইতিবাচক হিসেবে নেওয়া হয় না। উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিমাত্রই অসংযত উপায়ে নিজেকে সবার থেকে আলাদা প্রমাণ করতে চায়; অসদুপায় অবলম্বন করে হলেও লাভবান হতে চায়—এমনটাই সাধারণত ভাবা হয়ে থাকে। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উচ্চাভিলাষকে উন্নত লক্ষ্য হিসেবে অভিহিত করাই শ্রেয়। কারণ, সাধারণ মানুষের উচ্চাভিলাষ এবং তার উচ্চাভিলাষের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

মানুষ সাধারণত পার্থিব ক্ষমতা ও সম্পদের চিন্তায় বিভোর থাকে। উন্নত জীবনোপকরণের উচ্চাশা পোষণ করে। অপরদিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু ছিল আখিরাত। তিনি অহর্নিশি মৃত্যু-পরবর্তী চিন্তায় বিভোর থাকতেন। এজন্যই তার লক্ষ্য ছিল সবচেয়ে উন্নত ও অনন্য।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মায়ের গর্ভে তখনই যেন আপন লক্ষ্য বাস্তবায়নে পৃথিবীতে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিলেন! শৈশব থেকেই তিনি শুধ বিশ্বাস, ভালো ব্যবহার ও ন্যায়পরায়ণতায় সবার চেয়ে এগিয়ে থাকতে চাইতেন। চারপাশের মানুষ তার এই বিকাশমান উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে খালি চোখেই অনুধাবন করতে পারত। তার দাদা আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশদের মধ্যে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। এ কারণে কাবাঘরের সামনে তার জন্য একটি স্থান সংরক্ষিত ছিল। সেখানে তিনি ছাড়া আর কেউ বসার দুঃসাহস করত না। এমনকি

তার সন্তানেরাও না। অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনা বাধায় সেখানে চলে যেতেন। তার দাদার পাশে অনায়াসে জায়গা করে নিতেন। এই ব্যতিক্রম আব্দুল মুত্তালিব তার নিজের সন্তানদের ক্ষেত্রেও করেননি।

নেতৃত্ব-গুণ ছিল তার সহজাত বৈশিষ্ট্য। চারিত্রিক সৌন্দর্যের কারণে সমাজে সবাই তাকে একনামে চিনত। এমনকি তার ওপর ওহী নাযিল হবার আগে থেকেই মক্কার লোকেরা তাকে 'আল-আমীন' ও 'সত্যবাদী' বিশেষণে ভূষিত করেছিল। মূল্যবান বিষয়সম্পত্তির ক্ষেত্রেও তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ছাড়া আর কাউকে ভরসা করত না। তার প্রতি সাধারণ মানুষ ও কাফিরদের এতটাই গভীর বিশ্বাস ছিল।

শুধু তাই নয়; জ্ঞান ও বিচক্ষণতার ক্ষেত্রেও নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর তারা এমনই আস্থাশীল ছিল যে, যে-কোনো বিবাদে তাকে মীমাংসাকারী হিসেবে মেনে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না।

যুবক বয়সেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। সুতরাং, নবুওয়াতলাভের পর তার এই উৎকর্ষ কোন মাত্রায় পৌঁছেছিল—তা কল্পনারও অতীত! একজন নবী হিসেবে জীবন শুরু করে তিনি কোনো দিনও অর্থ, ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিপত্তির পেছনে ছুটে বেড়াননি। তিনি কেবল 'ওয়াসিলাহ' বা জান্নাতের সবচেয়ে সম্মানিত স্থানে অধিষ্ঠিত হতে চেয়েছেন। এমনকি অনুসারীদেরও তার জন্য এটাই প্রার্থনা করতে বলে গেছেন।

উত্তম এবং সুন্দর লক্ষ্যান্বেষী হবার কারণে মানব-ইতিহাসে তিনি অনন্তকাল পর্যন্ত আদর্শ হয়ে থাকবেন। তার এই উন্নত লক্ষ্যই তাকে দুনিয়ার পেছনে ছুটে বেড়ানো থেকে বিরত রেখেছে। তিনি জীবনে শুধু লক্ষ্য নির্ধারণ করেই বসে থাকেননি; বরং কর্মের মাধ্যমে তা অর্জনও করে গেছেন।

কুরআনের ভাষায় নবীজি

[এক]

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ

হে নবী, আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।[১]

উল্লেখ্য যে, কেউ কারও জন্য যথেষ্ট হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে তিনি ব্যতীত তার অন্যকারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই। অতএব, উল্লিখিত আয়াতের ভাষ্যমতে—

'আল্লাহ আপনার জীবনের সকল পর্যায়ের জন্য যথেষ্ট। তিনি ছাড়া আপনার আর কারও সাহায্যের দরকার নেই। বিপদে তিনিই আপনাকে সঙ্গ দিয়েছেন। দুঃসময়ে পাশে থেকেছেন। শত্রুর আক্রোশ থেকে রক্ষা করেছেন। ভবিষ্যতেও করবেন। জীবনের পদে পদে আপনাকে এভাবেই সুরক্ষা দেবেন। কাজেই, ভয় পাবেন না, দুঃখ করবেন না, সন্ত্রস্ত থাকবেন না, উদ্বিগ্নও হবেন না। আল্লাহ আছেন। তিনি আপনাকে সুরক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি আপনার সকল চাহিদা পূরণ করবেন। আপনি

[১] সূরা আনফাল, আয়াত : ৬৪

ক্ষমা চাইলে, তিনি আপনাকে ক্ষমা করবেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে, বর্ধিত পুরস্কার দেবেন। আপনি তাকে স্মরণ করলে তিনিও আপনাকে স্মরণ করবেন। শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় চাইলে, তিনি বিজয় দান করবেন।

সুতরাং, আপনি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকুন। তার সিদ্ধান্তকে কল্যাণকর মনে করুন এবং তার ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকুন। কারণ, তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট।

সুতরাং, বিদ্বেষীরা যদি সর্বত্র বিদ্বেষের আগুন জ্বালে, শত্রুরা যদি ষড়যন্ত্রের জাল বোনে, প্রতারকরা যদি প্রতারণার সূক্ষ্ম ফাঁদ রচনা করে—সর্বোপরি কাফির-মুশরিক ও মুনাফিক-শ্রেণি যদি আপনার বিরুদ্ধে সম্মিলিত-বাহিনী গঠন করে অথবা আপনার দুঃখ-দুর্দশায় যদি তারা উল্লাস করে, তবে আপনি ভয় পাবেন না; বিচলিত হবেন না। কারণ, আল্লাহ আপনার সঙ্গে আছেন। তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট।

সুতরাং, চরম দুঃসময়ে যখন পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন দূরে সরে যায়, বন্ধুরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সহযোদ্ধারাও হাল ছেড়ে দেয়—তখনো আপনি ধৈর্য ধরুন। দৃঢ়তার সঙ্গে সব কিছু মুকাবেলা করুন। কারণ, আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট। তার সাহায্য আপনার অতি নিকটে।

সুতরাং, যখন রোগ-শোক ও দুঃখ-দুর্দশা আপনাকে ঘিরে ধরে, দুর্যোগ-দুর্বিপাকে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে, অভাব-অনটনে জীবনের গতি মন্থর ও স্থবির হয়ে পড়ে, সংসারের মৌলিক চাহিদাগুলো অপূর্ণই রয়ে যায়—তখনো অবিচল থাকুন। একমাত্র আল্লাহর কাছেই উত্তরণ ও সাহায্য কামনা করুন। কারণ, তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট। রোগ-শোক ও অভাব-অনটন দিয়ে আপনার উপযোগিতা পরীক্ষা করছেন মাত্র।

সুতরাং, যখন অনন্যোপায় হয়ে শত্রুর আগ্রাসনের মুখে হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয়, বিজয়কে সুদূরপরাহত মনে হয় কিংবা অনিশ্চিত সাহায্যের আশায় কেবল তাকিয়েই থাকতে হয়—তখনো হতাশ হবেন না। কারণ, আপনি সুনিশ্চিত সাহায্য পেতে যাচ্ছেন। আল্লাহই আপনার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। তবে তিনি আপনার আস্থা ও ধৈর্যের মাত্রা পরখ করছেন।

হে মুহাম্মাদ, আপনি তো আমার খলীল, আমার প্রিয় বান্দা ও শ্রেষ্ঠ রাসূল! সুতরাং, আমিই আপনার জন্য যথেষ্ট। আপনি আমার জিম্মায় সুরক্ষিত।'

[দুই]

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا

চিন্তিত হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।[১]

এই প্রত্যয়দীপ্ত ও চিত্ত প্রশান্তকারী কথাটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ঠিক তখন বলেছিলেন যখন তারা শত্রুর খড়গহস্ত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পর্বত-গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, যখন শত্রু তাদের চারপাশ থেকে ঘেরাও করে ফেলেছিল এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু গুহার ভেতর থেকে স্পষ্টতই কাফিরদের পা দেখতে পাচ্ছিলেন এবং এই ভয়ে প্রকম্পিত ছিলেন যে, তারা গুহার ভেতরে একটু উঁকি দিলেই আল্লাহর রাসূলকে দেখে ফেলবে। সেই চরম দুঃসময়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন 'তুমি চিন্তিত হয়ো না'।

কথাটি বলার সময় তার ঠোঁট একবারও কাঁপেনি, তার জিহবা একটুও আড়ষ্ট হয়নি; বরং দৃঢ় চিত্তে তিনি কথাটি বলেছিলেন। কারণ, তিনি জানতেন 'আল্লাহ আমাদের সাথেই রয়েছেন'।

এই কথার মর্মার্থ হলো—

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন সাহাবী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলছেন, 'আল্লাহ যদি আমাদের সাথেই থাকেন তাহলে কীসের ভয়? কীসের হতাশা? কীসের এত চিন্তা? শান্ত হও, সংকল্পে অটল থাক। অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন। তিনিই আমাদের শত্রুর চোখ ও অস্ত্রের কবল থেকে রক্ষা করবেন।'

যতক্ষণ আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন, ততক্ষণ আমরা লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবো না। তিনি কখনোই আমাদের শত্রুর হাতে তুলে দেবেন না। আমাদের সঙ্গ ও সাহায্য ত্যাগ করবেন না। কাজেই আশাহত হলে চলবে না। আল্লাহর পথের অভিযাত্রীরা কখনো আশাহত হয় না। কারণ, তাদের পরাজয়ের ভয় নেই। চূড়ান্ত বিজয় তাদেরই। আল্লাহর চেয়ে শক্তিশালী আর কে আছে? কে আছে সাহায্যকারী?

---

[১] সূরা তাওবা, আয়াত : ৪০

তিনি ছাড়া আর কে দেখান পথের দিশা?

আল্লাহর সামনে সকল শত্রু দুর্বল। সকল প্রতিপক্ষ ভীরু। সকলের পা কম্পমান। আমরা কোনো লোকের সাহায্য চাইব না, কোনো সৃষ্টের নিকট হাত পাতব না। কারণ, সৃষ্টির কোনো উপাদানই আল্লাহর চেয়ে বেশি শক্তিশালী নয়; আল্লাহর চেয়ে অধিক সাহায্যপরায়ণ নয়।

আল্লাহর পথের অভিযাত্রীরা কোনো দিন ভয় পায় না। তারা সদা নির্ভিক। সদা তৎপর। স্রষ্টার বিশ্বাস ও আনুগত্যবোধ তাদের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। তারা সরল পথের পথিক। সত্য ও সুন্দরের অভিযাত্রী। তারাই শত্রুর ওপর বলীয়ান। মর্যাদায় মহীয়ান। এটাই চিরন্তন বাস্তবতা। কারণ, আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন। সুতরাং, হে আবু বকর, চিন্তিত ও বিষণ্ণ হয়ো না। ঝেড়ে ফেলো সকল দুশ্চিন্তা। আল্লাহ তো আমাদের সাথেই আছেন।

হে আবু বকর, এখন তো সময় শির উঁচু করে থাকার। নিজে শান্ত হও। হৃদয়কেও শান্ত করো। অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।

হে আবু বকর, আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী হও। মন খুলে তার প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ কামনা করো এবং সুখ ও সাফল্যের সুসংবাদ গ্রহণ করো। অবশ্যই আল্লাহ আমাদের সাথেই রয়েছেন।

[তিন]

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।[১]

হে মুহাম্মাদ[২], আল্লাহর শপথ, সর্বোত্তম চরিত্র তো আপনারই। শিষ্টাচার ও মহত্ত্বের আদর্শ তো আপনিই। মানুষ বাইরে থেকে দেখেই যদি আপনার আচরণকে সৌন্দর্যের আধার বলে থাকে, তাহলে লোকচক্ষুর আড়ালের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো তুলনাহীন! একজন মানুষের পক্ষে যে-সকল উত্তম গুণ ধারণ করা সম্ভব—তার সব কিছুই আপনার মাঝে ছিল। শত্রুরা আপনার প্রতি অবিচার করেছে,

[১] সূরা কালাম, আয়াত : ৪

[২] সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আপনি তাদের প্রতি সুবিচার করেছেন। তারা আপনাকে কষ্ট দিয়েছে, আপনি তাদের ক্ষমার চাদরে জড়িয়ে নিয়েছেন। তারা আপনাকে অভিসম্পাত করেছে, আপনি তাদের আশীর্বাদ দিয়েছেন। তারা আপনার সাথে কঠোর আচরণ করেছে, আপনি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করেছেন। সুতরাং, হে মুহাম্মাদ, নিশ্চয় আল্লাহ যা বলেন তা-ই সত্য, 'নিশ্চয় আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।'

কে আপনাকে ভালোবাসত না? রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, ছোট-বড়, চেনা-অচেনা—সবাই আপনাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসত। কারণ, আপনার মহানুভবতা দিয়ে তাদের হৃদয়রাজ্য আপনি জয় করে নিয়েছিলেন। আপনার অমায়িক ব্যবহার আর চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে তাদের মনকে করেছিলেন মন্ত্রমুগ্ধ।

নবুওয়াতের ঐশী ছোঁয়া আপনার চরিত্রকে ঢেলে সাজিয়েছে। আপনাকে পবিত্রতার আদর্শ করে তুলেছে। আপনার রব আপনাকে পথ দেখিয়েছেন। ফেরেশতা জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে আপনাকে শিক্ষাদান করেছেন। নিরাপত্তার চাদরে জড়িয়ে আপনার প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতি খেয়াল রেখেছেন। আপনার প্রতিটি চিন্তায়, প্রতিটি পদে, প্রতিটি কাজে তিনি পাশে থেকেছেন। একমাত্র তার রহমত ও বরকতেই আপনি হয়ে উঠেছেন সুমহান চরিত্রের অধিকারী।

আপনার মুখে সব সময় ভুবনমোহিনী হাসির ছোঁয়া লেগেই থাকত। হৃদয়ের মমতা ও ভালোবাসা সবার মাঝে স্নিগ্ধতা ছড়াত। দান ও বদান্যতা মানুষের মাঝে আশা জাগাত। এক কথায়, আপনি ছিলেন কল্যাণ ও বরকতের রাজপুত্র।

তলোয়ারের তীক্ষ্ণ চোখ রাঙানিও কোনো দিন আপনার সত্যবাদিতাকে হত্যা করতে পারেনি। নারী, সম্পদ ও ক্ষমতার প্রলোভন আপনার সংকল্প টলাতে পারেনি। অস্ত্র ও মৃত্যুর ভয় আপনাকে দায়িত্বপালন থেকে বিরত রাখতে পারেনি। কারণ, আপনি আল্লাহ প্রেরিত নবী। মানবসভ্যতার অনন্য আদর্শ। এ ধরনের অজস্র দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যেই আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

আপনার চরিত্রের মাহাত্ম্য এখানেই যে, ভয়ঙ্কর সব শত্রু যখন আপনাকে মৃত্যুভয় দেখিয়েছে তখনো আপনি সংকল্পে অটল ছিলেন; যারা আপনার সর্বস্ব কেড়ে নিতে চেয়েছিল, তাদের প্রতিও আপনি সদয় আচরণ করেছিলেন। আপনার মতো পুণ্যবান, জ্ঞানী, বিশ্বাসী, বিনম্র, উদার, ভরসার আধার এই পৃথিবীতে পূর্বে কখনো আগমন করেনি। ভবিষ্যতেও করবে না। হে মুহাম্মাদ, নিঃসন্দেহে আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।

[চার]

مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ

আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন।[১]

শত্রুরা আপনাকে উন্মাদ বলে কটাক্ষ করেছে; কিন্তু আপনি তো আদৌ উন্মাদ নন। অধিকন্তু আপনার হাতেই ছিল সকল উন্মাদনার প্রতিষেধক। মহান আল্লাহ সকল উন্মাদনা বিদূরিত করার লক্ষ্যেই আপনাকে নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এই ঐশী দায়িত্বের কারণেই আপনার চিন্তা ছিল সৃচ্ছ। মেধা ছিল ক্ষুরধার। কর্মক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

তাছাড়া প্রকৃত উন্মাদ তো সে, মহান আল্লাহর প্রিয় নবীকে যে উন্মাদ বলে। অথচ এরা শুধু আপনাকে উন্মাদ বলেই ক্ষান্ত হয়নি; বরং আপনার বিরোধিতা করেছে। আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সুতরাং, তারা মহা উন্মাদ। তাদের চেয়ে বড় উন্মাদ আর কে হতে পারে? 'আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি কিছুতেই উন্মাদ নন।'

সবচেয়ে বিজ্ঞ, মহান ও বিবেকবান মানুষটি কীভাবে উন্মাদ হতে পারে? আপনি তো ওহীর প্রজ্বলিত শিখা ধারণ করে সকল মিথ্যেকে নিশ্চিহ্ন করেছেন। সত্য ও মিথ্যের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। অজ্ঞতা ও মূর্খতাকে ভস্মিভূত করে জ্ঞানের আলোক-রেখা ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রতিটি কাজে মহান আল্লাহর অসামান্য সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেন। সার্বিক নিরাপত্তা পেয়েছেন। সুতরাং, আপনি কিছুতেই উন্মাদ হতে পারেন না।

আপনি তো কখনো সত্য বৈ মিথ্যে বলেননি। কল্যাণ বৈ অকল্যাণের পথে আহ্বান করেননি। আলো বৈ অন্ধকারের দিকে ডাকেননি। আপনি বোদ্ধাদেরও শিক্ষক। জ্ঞানীদেরও প্রশিক্ষক। নেতাদেরও পথপ্রদর্শক। সুতরাং, যে আপনাকে উন্মাদ বলে, সে সুস্পষ্ট মিথ্যেবাদী।

এটা তো সর্বজন স্বীকৃত যে, আপনি বিশ্বকে সত্য ও ন্যায়ের সন্ধান দিয়েছেন। জ্ঞান ও সভ্যতার আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। সুতরাং, আপনি কিছুতেই উন্মাদ হতে পারেন না। যে-মানুষটা গোটা মানবজাতিকে জ্ঞানের পাথেয় উপহার দিয়েছে, সত্য ও ন্যায়ের সন্ধান দিয়েছে সে কীভাবে উন্মাদ হতে পারে?

[১] সূরা কালাম, আয়াত : ২

কবি ঠিকই বলেছেন—

ঈসা[১]র ডাকে প্রাণ ফিরে পেত মড়দেহ
আপনার ডাকে প্রাণ ফিরে পায় যুগান্তরের প্রজন্ম।

[পাঁচ]

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন।[২]

হে মুহাম্মাদ, দ্বীনের হিদায়াত ও সত্যের পথ প্রদর্শন আপনার মিশন। পথহারা মানুষের সংশোধন এবং তাদের চিন্তা ও মননের পরিশীলন আপনার দায়িত্ব। তাদের জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে পাপাচারের নরক থেকে টেনে তোলা আপনার প্রধান লক্ষ্য। আপনি এবং শুধু আপনিই পারেন তাদের সংশোধন করে সরল পথের দিশা দিতে। তাই কেউ যদি প্রকৃত সুখ খুঁজে পেতে চায় তবে সে যেন আপনার পথ অনুসরণ করে। কেউ যদি ইহকালীন নিরাপত্তা ও পরকালীন মুক্তি কামনা করে তবে সে যেন আপনার নীতি ও মতাদর্শ মেনে চলে। কারণ, আপনার সালাত সবচেয়ে সুন্দর। আপনার সিয়াম সর্বাধিক পরিপূর্ণ। আপনার হজ সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। আপনার দান সবচেয়ে মহান। আপনার যিকির সবচেয়ে অর্থবহ।

'নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন।' সুতরাং, যে আপনার নেতৃত্বে হিদায়াতের তরীতে আরোহণ করবে, সে নির্বিঘ্নে মুক্তির বন্দরে পৌঁছে যাবে। যে আপনার প্রচারিত দ্বীনে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং যে আপনার রিসালাতের রজ্জু আঁকড়ে ধরবে, সে বিচ্যুতি থেকে বেঁচে যাবে।

সুতরাং, যে আপনাকে অনুসরণ করবে সে কখনো লাঞ্ছিত হবে না। যে আপনার দেখানো পথে চলবে, সে কখনো পদস্খলনের শিকার হবে না। যে আপনার আদর্শ ধারণ করবে, সে কখনো পরাস্ত হবে না। আপনার হিদায়াতের তরীতে যে আরোহণ করবে, সে কখনো দিকভ্রষ্ট হবে না। কারণ, আপনার দেখানো পথে বিচ্যুতি থাকতে পারে না। আপনার

[১] আলাইহিস সালাম
[২] সূরা শূরা, আয়াত : ৫২

অনুসৃত আদর্শে ভ্রান্তি থাকতে পারে না। আপনার পরিচালনায় ত্রুটির ভয় থাকতে পারে না।

'নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন।' শয়তানের ধোঁকা ও মিথ্যের মরিচীকায় খেই হারানো হৃদয়গুলোকে পথ দেখান। সংশয়ের চোরাবালিতে ডুবে যাওয়া মানুষগুলোকে টেনে তোলেন। নির্জীব প্রাণগুলোকে সজীব করেন। সৃষ্টিকে সৃষ্টির দাসত্ব থেকে উদ্ধার করে মহান আল্লাহর একাত্মবাদের পাঠ দেন।

'নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন।'—কখনো কাজে, কখনো কথায়, কখনো মৌনে; আবার কখনো আচরণে। কারণ, আপনি আপাদমস্তক হিদায়াতের চাদরে মোড়ানো। সত্য ও সরলতায় জড়ানো। মানব-প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুকূল।

[ছয়]

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ

হে রাসূল, আপনার ওপর আপনার রবের পক্ষ থেকে যা-অবতীর্ণ হয়েছে, আপনি তা পৌঁছে দিন।[১]

হে মুহাম্মাদ[২], ইসলামের যে-মহান বার্তা আপনার কাছে পূর্ণাঙ্গরূপে প্রেরিত হয়েছে, আপনি যথাযথভাবে তা প্রচার করুন। মানুষের কাছে পৌঁছে দিন। একটি বাক্য, শব্দ এমনকি একটি হরফও যেন ছুটে না যায়। কারণ, এটি ভরসার বাণী। আপনার প্রভুর সুমহান পয়গাম। তাছাড়া আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে। সুতরাং, আপনার ওপর অবতীর্ণ মহাসত্য প্রকাশ করুন। প্রতিটি বার্তা অক্ষরে অক্ষরে প্রচার করুন এবং তা দিয়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করুন।

وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

...আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তার পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না...।[৩]

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৬৭
[২] সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
[৩] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৬৭

মনে রাখবেন, আপনি কেবলই একজন বার্তাবাহক। কাজেই এতে যা নেই তা সংযোজন কিংবা যা আছে তা থেকে বিয়োজন করার অধিকার আপনার নেই। আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী আপনি প্রেরিত হয়েছেন এক সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য। কাজেই যেভাবে তা আপনার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, ঠিক সেভাবেই প্রচার করুন। আপনার এই প্রচারিত বাণী কেউ মানবে, কেউ মানবে না। কেউ আপনার অনুসরণ করবে, কেউ করবে না; কিন্তু এ নিয়ে আপনার বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আপনি আপনার মতো করে সত্য প্রচার করে যান। দুনিয়াবী কোনো কিছু যেন আপনার দায়িত্ব পালনের অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়—সে দিকে লক্ষ্য রাখুন। সব কিছু উপেক্ষা করে অর্পিত দায়িত্ব পালনে মনোনিবেশ করুন। মানুষের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিয়ে দায়িত্ব পরিপূর্ণ করুন।

আপনি সবার কাছে সযত্নে এই বাণী পৌঁছে দিন। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবা, প্রভু-ভৃত্য, ধনী-গরীব, জিন-ইনসান এবং ক্ষমতাহীন-ক্ষমতাবান—সবাই যেন এই বাণী থেকে উপদেশ লাভ করতে পারে। উপকৃত হতে পারে। সুতরাং, যা আপনার কাছে এসে পৌঁছেছে, তা প্রকাশ করুন। কোনো শত্রুকে পরোয়া করবেন না। উদ্ধত তলোয়ার আর সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীকে উপেক্ষা করে শুধু নেক নিয়তে প্রচার করতে থাকুন। খেয়াল রাখবেন, সম্পদ যেন আপনাকে মোহগ্রস্ত করতে না পারে। ক্ষমতা যেন আপনাকে অন্ধ করে না ফেলে। সম্মান ও মর্যাদার হাতছানি যেন আপনাকে প্রলুব্ধ না করে—অন্যথায় আপনি দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হবেন।

وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ

...আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তার পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না...[১]

যদি আপনি এই সত্যের বাণী পূর্ণাঙ্গরূপে প্রচার না করেন, বরং এর একটি শব্দ, বাক্য অথবা বাক্যাংশও গোপন করেন, তবে আপনি ব্যর্থ; আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্বপালনে অক্ষম। আল্লাহ যেভাবে আপনার নিকট জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে সত্যবার্তা প্রেরণ করেছেন, অবিকল সেভাবেই তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিন।

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৬৭

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

...আল্লাহ আপনাকে মানুষের (অনিষ্ট) থেকে রক্ষা করবেন...[১]

আল্লাহর প্রেরিত বার্তার ভার বহনে কাউকে ভয় করবেন না। আর কেন-ই বা আপনি ভয় করবেন?—স্বয়ং আমি আল্লাহ আপনার সঙ্গো আছি, আপনার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখছি এবং আপনাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি! কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না। কেউ আপনার অগ্রগতি রুখতে পারবে না। কেউ আপনার প্রাণ সংহার করতে পারবে না এবং আপনার বহন করা সত্যের মশাল কেউ নেভাতে পারবে না। কারণ, আমি নিজেই আপনার রক্ষাকর্তা। মহাসত্যের প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষাকর্তা। সুতরাং, আপনি নির্ভয়ে সত্যের বাণী প্রচার করুন। সত্যকে প্রকাশ করুন। কোনো সৃষ্টিকে ভয় পাবার কারণ নেই। অবশ্যই আমি আপনাকে রক্ষা করব।

দুনিয়ায় এমন কোনো শক্তি নেই, যা আপনাকে পরাজিত করতে পারে; এমন কোনো সেনাবাহিনী নেই, যারা আপনার প্রাণসংহার করতে পারে। এমন কোনো ক্ষমতাধর বাদশা নেই, যে আপনাকে গোলাম বানাতে পারে। কাজেই, নিশ্চিন্তে সামনে অগ্রসর হোন এবং ইসলামের বাণী প্রচার করতে থাকুন। এ কথা নিশ্চিত যে, আপনি অবশ্যই আপনার রবের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন।

[সাত]

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিইনি?[২]

আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিইনি? ক্ষমা, দয়া ও মহানুভবতায় আপনাকে সমৃদ্ধ করিনি? ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতা থেকে আপনার মন-মস্তিষ্ককে পবিত্র করিনি? জ্ঞানের আলো ও বিশ্বাসের জ্যোতিতে আপনার হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিনি? আত্মিক সুখ ও মানসিক শান্তিতে আপনার মনোজগৎ ভরে দিইনি?

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৬৭

[২] সূরা ইনশিরাহ, আয়াত : ১

আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিইনি? আপনাকে বিশাল হৃদয়ের অধিকারী বানাইনি? আপনি কি অন্যের দুর্বলতা গোপন করেন না? আপনি কি মানুষের বিরূপ আচরণ উপেক্ষা করেন না? নির্বোধদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করেন না? মূর্খদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন না? দুস্থ, দুর্বল ও অভাবীদের সাহায্য করেন না? অবশ্যই আপনি এগুলো করেন। কারণ, আমি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছি।

আমি আপনার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দিয়েছি—যাতে আপনি বয়ে যাওয়া সেই বাতাসের মতো হন, যা সবার জন্য উন্মুক্ত ও কল্যাণকর। এজন্য মানুষ আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে, আপনি তাদের ফিরিয়ে দেন না; বরং শত্রু ও বিপদের ভয় উপেক্ষা করে সাহায্য করেন। অভাবের ভয় না করে মুক্তহস্তে দান করেন।

আমি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছি—যাতে এটা আপনার জন্য শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনে; যাতে বিদ্বেষীদের উগ্র বাক্যবাণে জর্জরিত হলেও আপনার হৃদয়ে কেবলই দয়া, ক্ষমা ও সহনশীলতার উদ্রেক ঘটে।

আমি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছি—যাতে আপনি বেদুঈনদের বেপরোয়া আচরণে ধৈর্যধারণ করতে পারেন। প্রতিপক্ষের ঔদ্ধত্য, বিদ্বেষ ও শত্রুভাবাপন্ন আচরণ সহ্য করতে পারেন। তাদের সকল ষড়যন্ত্রের মুখে অটল ও অবিচল থাকতে পারেন।

আমি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছি—যাতে কঠিন বিপদেও আপনার মুখে হাসি লেগে থাকে। সঙ্কটে নিপতিত হয়েও হৃদয়ে অটুট আস্থা ও কৃতার্থতা বিরাজ করে। এক কথায়, বৈষয়িক দুঃখ-কষ্ট ও রোগ-শোকে আপনি অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকেন।

আমি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছি—যাতে সেখানে অজ্ঞতা, রূঢ়তা ও কঠোরতা বাসা বাঁধতে না পারে; বরং সেখানে যেন কেবলই দয়া, অনুকম্পা ও কোমলতা অবস্থান করে।

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ

আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা।[১]

আমি আপনাকে পাপের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করেছি। আপনার সকল ভ্রান্তির বীজকে বিনষ্ট করেছি। আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে

[১] সূরা ইনশিরাহ, আয়াত : ২

দিয়েছি। সুতারং, এখন আপনি ক্ষমালাভের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। মহাসাফল্য অর্জনের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ

যা ছিল আপনার জন্য অতিশয় দুঃসহ।[১]

নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব আপনাকে ভারাক্রান্ত করে ফেলেছিল। এর ভার বহন আপনার জন্য কষ্টকর ও দুর্বহ হয়ে পড়েছিল এবং আপনাকে ক্রমশ দুর্বল করে ফেলছিল; কিন্তু এখন আপনাকে এর ভার থেকে মুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে। তাই ভারমুক্তির সুসংবাদ গ্রহণ করে আনন্দিত হোন।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।[২]

যেখানে আমার আলোচনা হয় সেখানে আপনারও আলোচনা করা হয়। আমাদের দুজনের নাম সব সময় পাশাপাশি থাকে। আযানের সময়, সালাতের সময়, গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময়—যখন যেখানে আমাকে ডাকা হয়, সেখানে আপনার প্রিয় নামটিও উচ্চারিত হয়। এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে? সালাত পালনকারী, হজ আদায়কারী, খুতবা প্রদানকারী—সবাই সবখানে আমার সাথে আপনাকেও স্মরণ করে। আপনি কি এর চেয়েও বড় মর্যাদা চান?

তাছাড়া তাওরাত ও ইঞ্জিলেও আপনার কথা বলা আছে। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে আপনাকে সম্মানিত করা হয়েছে।

আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি—যাতে আপনার নাম সূর্যের আলোর মতো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে; আলোর গতিতে সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দেয়; প্রত্যেক নগরবাসী আপনাকে চেনে, প্রত্যেক জনপদ আপনার নাম জানে, সবাই শুধু

[১] সূরা ইনশিরাহ, আয়াত : ৩

[২] সূরা ইনশিরাহ, আয়াত : ৪

আপনার কথা জিজ্ঞেস করে। ছোট থেকে বড়—সব মজলিসে আপনাকে স্মরণ করে।

আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি। এজন্যই এত এত বছর কেটে যাবার পরও কেউ আপনাকে ভুলে যায়নি। আপনার নাম ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে যায়নি। কত মানুষেরই তো গৌরবময় ইতিহাস আছে! কিন্তু তাদের কয়জনকে মানুষ মনে রেখেছে? তাদের কয়জনকে মানুষ চর্চা ও অনুসরণ করছে?

মুসলিমজাতির কেউ যদি স্মরণীয় হয়ে থাকে তবে সেটা এজন্য যে, সে আপনাকে চর্চা করেছে। আপনার দেখানো পথ অনুসরণ করেছে। এজন্যই মানুষ হাদীস মুখস্থকারী ও বর্ণনাকারীদের মনে রেখেছে। কারণ, তারা আপনার বাণী ধারণ ও প্রচারের দুর্লভ সম্মান লাভ করেছে।

সময়ের ভাঙনে কত সভ্যতা বিলীন হয়ে গেছে! অথচ আপনার নামে একটু আঁচড়ও লাগেনি। আপনার সুন্নাহ, আপনার ওপর নাযিলকৃত কুরআন—সবই এখনো আগের মতোই আছে। কোথাও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি। রাজাদের রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে, অথচ আপনার সম্মান-সম্ভ্রম আগের মতোই রয়ে গেছে; বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ, হৃদয়ের ব্যাপ্তিতে, চিন্তার গভীরতায় এবং আদর্শের উচ্চতায় আজও কেউ আপনার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারেনি।

আমি আপনার নামকে সমুন্নত করেছি। যখন কোনো সালাত আদায়কারী তাশাহুদ পড়ে, তখন সে আমার সাথে আপনাকেও স্মরণ করে। যখন কোনো হজ পালনকারী বাইতুল্লাহর গিলাফ ধরে আমাকে ডাকে তখন সে রওজার পাশে দাঁড়িয়ে আপনাকেও স্মরণ করে। তাই সকল প্রশংসা আপনার রবের—যিনি আপনাকে এত উঁচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন।'

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি।[১]

বিপদে পড়ে যখন মনে হবে, মুক্তির পথ হয়তো রুদ্ধ হয়ে গেছে; সংকটে পড়ে যখন মনে হবে, উত্তরণের পথ অবরুদ্ধ হয়ে গেছে; তখনই বুঝবেন, রাত পোহাবার অতিঅল্প সময় বাকি আছে; অবারিত মুক্তি ও শান্তি আপনাকে অদূরেই হাতছানি

[১] সূরা ইনশিরাহ, আয়াত : ৫

দিচ্ছে। সুতরাং, হতাশ হবেন না। অভাবের পরেই প্রাচুর্য আসে। অসুস্থতার পরেই সুস্থতা আসে। দুঃখের পরেই সুখেরা দল বেঁধে ছুটে আসে। ভয়ের পরেই নিরাপত্তা ফিরে আসে। তবে এজন্য মাঝের সময়টুকু ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করতে হয়। এই অপেক্ষার জন্যই সুখ, সচ্ছলতা ও নিরাপত্তার এত মূল্য!

হে মুহাম্মাদ, আপনি এবং আপনার অনুসারীরা অবশ্যই সুদিন দেখবেন। আল্লাহর অনিঃশেষ নিয়ামত প্রত্যক্ষ করে কৃতার্থ হবেন। আজ অথবা কাল—বিজয় আপনাদেরই হবে। কারণ, এটা পরিষ্কার যে, জীবনে কষ্টের পরেই স্বস্তি আসে। রাতের পরেই দিন আসে। কষ্টের বিশাল পাহাড় অতিক্রম করলেই বিস্তীর্ণ সমতল ভূমির দেখা মেলে। শুষ্ক মরুর শেষেই সবুজের সমারোহ হৃদয় কাড়ে।

তাছাড়া কথায় আছে—বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো। অর্থাৎ, নিয়মের কড়াকড়ি যত বাড়বে ফাঁকি দেওয়া ফাঁকফোকরও তত বৃদ্ধি পাবে। এই কথাটি কষ্টের ক্ষেত্রে সমান প্রযোজ্য। কেননা, কষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশা যখন চরমে গিয়ে পৌঁছে, ঠিক তখনই তার সমাপ্তি ঘটে। শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসে। পথিক তখন খুব সহজেই ঠিকানা খুঁজে পায়। অভাবী ব্যক্তি সচ্ছলতা ফিরে পায়। রোগী আরোগ্য লাভ করে। কয়েদী মুক্তি পায়। আশ্রয়প্রার্থী নিরাপদ আশ্রয় পায়। তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা মিটে যায়। এক কথায়, অবস্থা যা-ই হোক না কেন, সবর ও শোকরের পরিচয় দিলে আল্লাহ অবশ্যই কষ্টের পরে স্বস্তি ফিরিয়ে দেন।

সূরা ইনশিরাহ'র এই অংশটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল জীবনের কঠিনতম সময়ে—যখন দুঃখ-দুর্দশা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছিল। আত্মীয়-পরিজন দূরে সরে গিয়েছিল। স্বগোত্রের লোকেরা ঠাট্টা-বিদ্রূপে মেতে উঠেছিল। কাফির-মুশরিকদের নির্যাতন ও ষড়যন্ত্র মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধৈর্যের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছিলেন—তখন আল্লাহ তাকে বিপদমুক্তির আশ্বাস ও নিরাপত্তার সুসংবাদ দিতে সূরা ইনশিরাহ নাযিল করেন। এতে উল্লেখিত সকল ওয়াদাই আল্লাহ পূরণ করেন। তাই কিয়ামতের আগ পর্যন্ত তা মানুষের জন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। সূরার পরবর্তী অংশে বলা হচ্ছে—

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ

অতএব, আপনি যখনই অবসর পান তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হোন।[১]

[১] সূরা ইনশিরাহ, আয়াত : ৭

পার্থিব কাজ-কর্ম ও ব্যক্তিগত ব্যস্ততা সেরে একান্তে আমার ইবাদাত করুন। আমাকে স্মরণ করুন। আমার কাছে প্রার্থনা করুন। মানুষের অভিযোগ-আবেদন সমাধা করামাত্রই আমার দ্বারস্থ হোন। সামাজিক দায়িত্ব থেকে অবসর হয়েই আমাকে ডাকুন। আমার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করুন। আমার সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ুন। মনে রাখবেন, যদি আপনি শুধু আমারই জন্য কপালকে ধূলিধূসরিত করেন, তবে আমি আপনাকে এনে দেবো নিরাপত্তা, সাফল্য এবং চিরমুক্তি।

স্ত্রী-সন্তান, পরিবার-পরিজন এবং আত্মীয়-স্বজনকে সময় দেওয়া শেষ হলে আমার যিকির-ইবাদাতে সময় দিন। আপনার সমস্যা আমি জানি। তবুও আমাকে কায়মনোবাক্যে সমস্যা সম্পর্কে অবগত করুন। আপনার প্রয়োজনে কেবল আমার কাছেই প্রার্থনা করুন। বিপদে আমার সাহায্য গ্রহণ করুন। অপরাধ হয়ে গেলে আমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

মানুষকে দ্বীনের শিক্ষা ও কল্যাণের পথ দেখানো শেষেও আমার কাছেই ফিরে আসুন। আমার কাছে এলেই আমি আপনাকে করুণার চাদরে জড়িয়ে নেবো। আমার কাছে চাইলেই আমি নিয়ামত বাড়িয়ে দেবো। নিজের ওপর আপনার যতটা না অধিকার আছে, তারচেয়ে বেশি অধিকার আছে আমার। কারণ, আমি আপনাকে সৃষ্টি করেছি। আপনার সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। সুতরাং, আপনি ও আপনার অবসর তো আমারই অধিকার।

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।[১]

আমি ছাড়া আর কারও শরণাপন্ন হবেন না। আর কারও সাহায্য চাইবেন না। কেবল আমারই শরণাপন্ন হবেন। আমারই সাহায্য প্রার্থনা করবেন; আমারই ওপর ভরসা করবেন এবং একমাত্র আমাকেই ভয় করবেন। কারণ, পুণ্যবানদের সাহায্য প্রদানে এবং পাপিষ্ঠদের শাস্তিবিধানে আমিই যথেষ্ট। তাই শুধু আমাকেই ভয় করুন। আমার ওপরই আশা রাখুন। আমারই ইবাদাত করুন। আমার প্রতিই মনোনিবেশ করুন। আমি আপনাকে সাহায্য করব, নিরাপত্তা দেবো এবং প্রাচুর্যময় করব।

[১] সূরা ইনশিরাহ, আয়াত : ৮

[আট]

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

নিশ্চয় আমি আপনাকে দান করেছি সুস্পষ্ট বিজয়।[১]

হে মুহাম্মাদ, আমি আপনাকে মহান বিজয় দান করেছি। আপনার জন্য মানুষের হৃদয়কে কোমল ও উর্বর করে দিয়েছি; ফলে আপনি সেখানে ঈমানের বৃক্ষ রোপণ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমি আপনার জন্য তাদের বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছি; ফলে আপনি সেখানে বিশ্বাসের বীজ বপন করতে পেরেছেন। আমি আপনাকে রাজনৈতিক বিজয় দান করেছি; ফলে আপনি বিশ্বব্যাপী সত্য ও হিদায়াতের বাণী প্রচার করতে সমর্থ হয়েছেন। আমি আপনার জন্য জ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছি; ফলে আপনি জ্ঞানের আলোয় জগৎ উদ্ভাসিত করতে পেরেছেন। জিন-ইনসান সকলের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

অথচ এই কিছুদিন আগেও আপনি অবরুদ্ধ ছিলেন; জ্ঞানের স্পর্শ-বঞ্চিত নিরক্ষর ছিলেন; কিন্তু আজ জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণীরা আপনার দ্বারে ভিড় জমায়—আপনার জ্ঞান-সাগর থেকে উপকৃত হওয়ার আশায় সকাল-সন্ধ্যা ধরনা দেয়।

আমি আপনাকে সম্পদ দিয়েছি—যাতে করে আপনি পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে হাত খুলে দান করতে পারেন। আমার দেওয়া সম্পদ থেকেই আপনি অন্নহীনকে অন্ন দিয়েছেন। বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিয়েছেন। অসহায়কে সাহায্য করেছেন এবং নিঃস্বকে দান করেছেন।

আমি আপনাকে মহান বিজয় দান করেছি। শহর-নগর, গ্রাম-জনপদ—সব আপনার অধীন করে দিয়েছি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আমি আপনাকে সঙ্গ দিয়েছি। সাহায্য করেছি। পথ দেখিয়েছি। ফলে আপনার প্রচারিত দ্বীন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আপনার মতাদর্শ অনুসৃত হয়েছে। ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করেছে। সুতরাং, কেবল আমার প্রতিই বিনীত থাকুন। আমারই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

---

[১] সূরা ফাতহ, আয়াত : ১

[নয়]

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।[১]

হে মুহাম্মাদ, এখন যেহেতু আপনি জেনেই গেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাই তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবেন না। তিনি ছাড়া আর কারও কাছে প্রার্থনা করবেন না; বরং শুধুই তাঁর ইবাদাত করবেন। কোনো কিছু চাইতে হলে তাঁরই কাছে চাইবেন। কারণ, একমাত্র তিনিই আপনাকে মন্দ ও অনিষ্টের হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখেন; আপনার অভাব দূর করার মতো প্রাচুর্য ধারণ করেন। তিনি ছাড়া আর কেউ কোনো অভাবীর অভাব দূর করতে পারে না।

জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং, কেবল তাকেই মান্য করবেন। তাকেই ভালোবাসবেন। তাকেই ভয় করবেন। তাঁর আনুগত্যের বাইরে গিয়ে কাউকে মান্য করবেন না। তাঁর ভালোবাসাকে উপেক্ষা করে কাউকে ভালোবাসবেন না। তাকে ছাড়া আর কাউকে ভয় পাবেন না। মনে রাখবেন, যে তাকে যত বেশি ভালোবাসে, সে তাঁর তত বেশি নৈকট্য লাভ করে। যে তাকে যত বেশি মান্য করে, সে তাঁর তত বেশি সন্তুষ্টি লাভ করে। যে তাকে যত বেশি ভয় করে, সে তাঁর শাস্তি থেকে তত বেশি নিরাপদ থাকে। যে তাঁর যত বেশি প্রশংসা করে সে তত বেশি পুরস্কার লাভ করে। একইভাবে যে তাঁর অবাধ্য হয়, তাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়। যে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে, সে অনিবার্য ধ্বংসের শিকার হয়।

জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং, যে তাকে ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করবে, সে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। যে তাকে অবিশ্বাস করবে, সে চরম লাঞ্ছনাকর শাস্তির মুখোমুখি হবে। আসমান-যমীনে কেবল তাঁরই রাজত্ব ও উপাসনা চলবে এবং বিচার দিবসে হিসেবের জন্য তাঁরই সামনে সবাইকে দাঁড় করানো হবে।

[১] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ১৯

জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং, একমাত্র তাঁরই ইবাদাতে নিজেকে নিয়োজিত রাখুন। আপনার সকল নির্ভরতা হোক কেবল তাঁরই প্রতি। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। দুঃসময়ের ত্রাণকর্তা ও নিরাপত্তা দানকারী। কাজেই আপনার সার্বিক কল্যাণ ও প্রয়োজনের জন্য তিনিই যথেষ্ট। মন খুলে তাঁর কাছে প্রার্থনা করুন। তাঁর শাস্তিকে ভয় করুন। শাস্তিদাতা হিসেবে তিনি অত্যন্ত কঠোর। তাঁর শাস্তি মানুষের কল্পনারও অতীত। কখনো তাঁর বেঁধে দেওয়া সীমা অতিক্রম করবেন না। এমনকি তাঁর অনুগত বান্দাদেরও বিরোধিতা করবেন না। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ তাদের হয়ে প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন।

তাঁর কাছে ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করুন। পুরস্কারেরও আশা রাখুন। কারণ, একমাত্র তিনিই বান্দার অপরাধ ক্ষমা করার অধিকার রাখেন। বান্দাকে আশ্রয় ও পুরস্কার দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত সামর্থ্য রাখেন। সুতরাং, তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসা ও কল্যাণ পেতে হলে তাঁর স্মরণকে অভ্যাসে পরিণত করুন—না, বরং নেশায় পরিণত করুন। সেই সঙ্গে তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন। ধর্মীয় বিধি-নিষেধকে সম্মান করুন। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন। এভাবে আপনি সরাসরি আল্লাহর জিম্মায় চলে যাবেন এবং বিজয় ও মহাপুরস্কারে ভূষিত হবেন।

[দশ]

اقْرَأْ

পড়ো।[১]

নবুওয়াতের গল্পটা শুরু হয়েছিল 'পড়ো' দিয়ে। হেরা গুহায় অবস্থানরত মানুষটিকে যেদিন এই আহ্বান জানানো হয়েছে, সেদিনই মুসলিমজাতি হিসেবে আমাদের জন্ম হয়েছে; জ্ঞান ও সভ্যতার পথে মানবতার যাত্রা শুরু হয়েছে; পৃথিবীর ইতিহাস ও ঐতিহ্য নতুন পথে মোড় নিয়েছে। কাজেই 'পড়ো' আমাদের শেকড়। গর্ব ও অহংকার। ইতিহাস-ঐতিহ্যের সূতিকাগার।

এই 'পড়ো'র মাধ্যমেই মহান আল্লাহ সত্য ও মিথ্যের পার্থক্য রচনা করেছেন। আলো ও আঁধারকে আলাদা করেছেন। অজ্ঞতাকে বিদূরিত করে জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত

[১] সূরা আলাক, আয়াত : ১

করেছেন। আরবী শব্দকোষের বিশাল ভাণ্ডার থেকে মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে উচ্চারণ করতে বললেন, 'পড়ো'। তিনি বলতে পারতেন 'লেখো', 'প্রার্থনা করো', 'বলো', 'ভালো কাজ করো' ইত্যাদি; কিন্তু তিনি তা করেননি; বরঞ্চ সত্যের উন্মোচন ঘটিয়েছেন সাধারণ অথচ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ 'পড়ো' শব্দ দিয়ে। 'পড়ো' শব্দ দিয়ে আলোর পথের এই যাত্রা শুরু করার রহস্য এটাই ছিল যে—'হে মুহাম্মাদ, আপনি অন্যকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পূর্বে নিজে পড়ুন; ভালো কাজ শুরু করার পূর্বে জ্ঞান অন্বেষণ করুন এবং 'জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। আর ক্ষমাপ্রার্থনা করুন—নিজের ত্রুটির জন্য...।'[১]

উল্লেখ্য যে, পড়া কোনো শখের বিষয় না; অবসর কাটানোর বিষয় তো কিছুতেই না; বরং পড়া হলো জীবনের চালিকাশক্তি। কাজেই জীবনকে গতিশীল করতে হলে মূর্খতাকে পরিত্যাগ করে জ্ঞান অন্বেষণ করার কোনোই বিকল্প নেই—বরং এটাই মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আমার পিতা-মাতা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য কুরবান হোক! তিনি কীভাবে পড়বেন? কী দিয়ে শুরু করবেন? তিনি তো কারও কাছ থেকে লেখাপড়া শেখেননি। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও শেখার চেষ্টা করেননি। তবে কীভাবে পড়বেন? কী দিয়ে শুরু করবেন? তার এই অজস্র প্রশ্ন ও অজ্ঞতার অবসান ঘটিয়ে তৎক্ষণাৎ অবতীর্ণ হয়—'পড়ুন আপনার প্রভুর নামে। যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন।'

সেই সঙ্গে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এখন থেকে আপনি আপনার রবের বাণী পড়বেন এবং তাঁরই নামে শুরু করবেন। এখন থেকে প্রতিনিয়ত আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনাকে জ্ঞানমূলক প্রত্যাদেশ করা হবে। আপনি তা নিজে পড়বেন এবং অন্যদেরও পড়ে শোনাবেন।

'পড়ো'-এর মাধ্যমে একটি জাতির গোড়াপত্তন ও একটি ধর্মের শুভসূচনা বিশ্বমানবতার সামনে জ্ঞানার্জনের তীব্র গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা তুলে ধরে। পৃথিবীর ইতিহাসে যারা সুখ ও সাফল্য অর্জন করেছে, তারা জ্ঞানকেই প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছে। কারণ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর অবতারিত প্রথম ওহী—'পড়ো'-এর মধ্যে প্রভূত কল্যাণ নিহিত আছে। কেননা, এই বার্তা প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং পুণ্যকর্মের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বিধান করে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

[১] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ১৯

إِنَّ مَثَل مَا بعَثنى اللّٰه بِهِ منَ الْهُدَى والْعلْمِ كَمَثَلَ غَيْثٍ

মহান আল্লাহ আমাকে যে-জ্ঞান ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার উদাহরণ হলো বর্ষণমুখর মেঘমালার ন্যায়। (যা আসমান থেকে বর্ষিত হয়ে ফসল ফলায়)।[১]

[১] সহীহ বুখারী : ৭৯; সহীহ মুসলিম : ২২৮২; হাদীসটি আবু মুসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

নবীজির কান্না

কান্না ভালো, না মন্দ? পুরুষের চোখে অশ্রু শোভা পায়, না পায় না? কান্না কি মেয়েলি স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ?—সে ব্যাপারে অনেকে সন্দিহান হলেও এতটুকু সুনিশ্চিত সত্য যে, সব সময় চোখের জল ফেলা কাম্য নয়; প্রশংসনীয় তো কিছুতেই নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষ অবশ্যই তা পৌরুষের বিপরীত, কিংবা নিতান্তই বোকামি। তারপরও জীবনে এমন কিছু মুহূর্ত আসে, যখন অশ্রু সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ে। সে-সব মুহূর্তে বরং কান্নাই স্বাভাবিক, সহজাত ও প্রশংসনীয়।

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনরত চোখের চেয়ে সুন্দর আর কী হতে পারে? বস্তুত নিজের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চাওয়া এবং আল্লাহর স্মরণে অশ্রু বিসর্জন দেওয়া একটি মহৎ গুণ। অনুশোচনা ও পবিত্রতার বহিঃপ্রকাশ। এ অবস্থায় চোখের জল প্রশংসার দাবি রাখে। এমন দামি অশ্রুজলের প্রশংসা করে মহান আল্লাহ বলেন—

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

তাদের কাছে যখন দয়াময় আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং ক্রন্দন করে।[১]

[১] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৫৮

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

তারা ক্রন্দন করতে করতে অবনত মস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরও বৃদ্ধি পায়।[১]

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ

আর তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শোনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রুপূর্ণ দেখতে পাবেন; এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনতে পেরেছে।[২]

অপরদিকে কঠোর হৃদয় ও কঠিন স্বভাবের লোকদের তিরস্কার করে বলেন—

أَفَمِنْ هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۝ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝

তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? হাসছ? কাঁদছ না?[৩]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হৃদয় ছিল অত্যন্ত কোমল। তিনি আল্লাহকে সর্বাধিক ভালোবাসতেন। সর্বাপেক্ষা বেশি ভয় করতেন। তার ভয় ও ভালোবাসায় অশ্রু বিসর্জন দিতেন। পরকালের চিন্তা, জাহান্নামের বর্ণনা, আল্লাহর শাস্তির ভয়—সব কিছুই তার চোখকে অশ্রুসজল করে তুলত। কুরআন তিলাওয়াতের সময় প্রায়ই তাকে চোখের পানি ফেলতে দেখা যেত। তার এ কান্না সাহাবীদের মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলত।

এক রাতের ঘটনা। হঠাৎ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুম থেকে উঠে সালাতে দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করে কাঁদতে কাঁদতে সারাটা রাত কাটিয়ে দেন—

[১] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ১০৯

[২] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৮৩

[৩]সূরা নাজম, আয়াত : ৫৯-৬০

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم

যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার বান্দা। (সুতরাং, শাস্তি দিতেই পারেন।) আর যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার ইবনু মাসউদকে বলেন, 'আমাকে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনাও।' ইবনু মাসউদ উত্তর দেন, 'আমি আপনাকে শোনাবো! কুরআন তো আপনার ওপরই অবতীর্ণ হয়! নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তুমি তিলাওয়াত করো। অন্যের তিলাওয়াত শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।' এ কথা শুনে ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সূরা নিসা তিলাওয়াত করতে শুরু করেন। যখন এই আয়াতে এসে পৌঁছেন—

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

অতঃপর, যখন আমি প্রত্যেক উম্মত হতে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব তখন কী অবস্থা হবে?[২]

তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'থামো, আপাতত এটুকুই তোমার জন্য যথেষ্ট।' এর পরবর্তী অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তিলাওয়াত শেষ করে আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি, তার চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।'[৩]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই এভাবে অন্যের তিলাওয়াত শুনতেন। তিলাওয়াত শুনে হতবিহ্বল হয়ে যেতেন। একরাতে তিনি অত্যন্ত চুপিসারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুর তিলাওয়াত শোনেন। পরদিন

[১] সূরা মায়িদা, আয়াত : ১১৮
[২] সূরা নিসা, আয়াত : ৪১
[৩] *সহীহ বুখারী* : ৪৫৮২, ৫০৫৫; *সহীহ মুসলিম* : ৮০০, হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

সকালে তাকে ডেকে বলেন, 'আমি গতরাতে তোমার তিলাওয়াত শুনে মুগ্ধ হয়েছি। তোমাকে তো দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর কণ্ঠস্বর দেওয়া হয়েছে! আচ্ছা, তুমি যদি আমার উপস্থিতি আঁচ করতে পারতে তাহলে কী করতে? আবু মূসা আশআরী বলেন, 'যদি আমি জানতাম, আপনি আমার তিলাওয়াত শুনছেন, তাহলে আরও সুন্দর করে তিলাওয়াত করার চেষ্টা করতাম।'[১]

সহীহ সূত্রে বর্ণিত অপর একটি হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু শিখখীর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'একবার আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যাই। গিয়ে দেখি, তিনি সালাত আদায় করছেন। কান্নাজনিত কারণে তার বুক থেকে ফুটন্ত ডেকের মতো শব্দ হচ্ছে—তিনি শিশুদের মতো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছেন।'

আরেক দিনের ঘটনা। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় কন্যা যাইনাব রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর জানাযায় উপস্থিত হন। জানাযার পর তিনি যখন মাইয়িতকে কবরে রাখার জন্য ভেতরে প্রবেশ করেন তখন কবরের সংকীর্ণতা দেখে এবং ভয়াবহতা চিন্তা করে তার চোখদুটো অশ্রু-ছলছল হয়ে ওঠে। কারণ, তিনি মৃত্যু, মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থা এবং জান্নাত-জাহান্নামের অনন্ত জীবন সম্পর্কে জানতেন। তাই তার চোখজুড়ে অশ্রুর বাঁধভাঙা জোয়ার নেমে আসে। নবীজির এই কান্না দেখে সাহাবীগণ শিউরে ওঠেন। কারণ, তারা জানতেন, যার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়েছে, তিনিই যদি এভাবে কাঁদেন, তবে তাদের এর চেয়েও বেশি কাঁদতে হবে!

তাই আল্লাহর জন্য ক্রন্দন করার এই মহৎ গুণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিখিয়ে গেছেন এবং ক্রন্দনের অনন্য সাধারণ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে আমাদের উৎসাহিত করেছেন। হাশরের ময়দানে আল্লাহর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। আর সেই আরশের নিচে সাত শ্রেণির লোক ছাড়া আর কেউ জায়গা পাবে না। সেই সাত শ্রেণির একটি শ্রেণির বর্ণনা দিতে গিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'এবং ওই ব্যক্তি সেই ছায়ায় আশ্রয় পাবে—যে নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নীরবে অশ্রু বিসর্জন দেয়।'[২]

---

[১] *সুনানু কুবরা* : ৪৪৮৪, ২০৮৪১; *শুআব* : ২৬০৪

[২] *সহীহ বুখারী* : ৬৬০, ১৪২৩, ৬৮০৬; *সহীহ মুসলিম* : ১০৩১, হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অপর এক হাদীসে এসেছে—

“

عَيْنَانِ لَا تَمَسُّهُمَا النَّارُ : عَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللهِ

দুই প্রকারের চোখকে জাহান্নামের আগুন কোনো দিন স্পর্শ করতে পারবে না। এক. যে-চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে। দুই. যে-চোখ দ্বীন রক্ষায় জিহাদের ময়দানে বিনিদ্র জেগে থাকে।

যে-চোখ আল্লাহর ভয়ে ভিজে ওঠে, সৃষ্টির নিদর্শন দেখে স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতায় আর্দ্র হয়ে ওঠে, বিচার দিবসে আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার ভয়ে ছলছল হয়ে ওঠে—সে-চোখ আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়। সে-চোখের অশ্রু ইসলামে প্রশংসনীয়। কারণ, এই চোখ, এই অশ্রু এবং এই কান্নাই নিজেকে আল্লাহর হাতে সঁপে দেওয়ার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর মাধ্যম। কাজেই পাপের অনুশোচনা থেকে যে-কান্না আসে, সে-কান্না সবচেয়ে দামি। আল্লাহর শাস্তির ভয়ে এবং আখিরাতের চিন্তায় যে-চোখের পাতাদুটো ভিজে ওঠে সে-চোখ সবচেয়ে মহান। ঈমান ও আনুগত্যের স্বল্পতার কথা ভেবে মনের গভীরে যে-শূন্যতা তৈরি হয়, চোখের কোণে যে-মেঘ জমা হয় সেই শূন্যতা ও অশ্রুবৃষ্টি সবচেয়ে প্রশংসনীয়।

কিন্তু পার্থিব কোনো কিছুর জন্য কান্না মোটেও প্রশংসনীয় নয়। ক্ষণস্থায়ী এই দুনিয়ায় কোনো কিছু না পাওয়া, কিংবা অবাঞ্ছিত কিছু পেয়ে দুঃখ করতে থাকা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিতান্তই খেলার সামগ্রী। একেবারেই তুচ্ছ বস্তু। কাজেই এর জন্য কান্না ও অশ্রুপাত গ্রহণযোগ্য নয়; পৌরুষের পরিচয় তো কিছুতেই নয়।

উল্লেখ্য যে, কান্নার ক্ষেত্রেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুসরণীয়। কারণ, তিনি নিজেও আল্লাহকে ভালোবেসে ভয় করতেন; তার শাস্তির কথা চিন্তা করে ক্রন্দন করতেন। তিনি জানতেন, পার্থিব-জীবনই শেষ নয়; বরং অনন্ত জীবনের শুরুমাত্র। এই জীবন পুণ্যময় হলে আখিরাতের জীবন সুখময় হবে। তাই তিনি সেই অনন্ত জীবনের কথা ভেবে কাঁদতেন।

দুনিয়াবাসীর নিকট যা চরম আকাঙ্ক্ষিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে তা মূল্যহীন। সম্পত্তি অর্জনে ব্যর্থতা, প্রেমাস্পদকে বিয়ে করতে না পারার

মনস্তাপ কিংবা ব্যবসায় ক্ষয়ক্ষতি—কোনো দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কান্নার কারণ হতে পারেনি। এমনকি তার চিন্তায়ও আসতে পারেনি। কখনো যদি তার মন দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত, চোখজোড়া আর্দ্র হয়ে উঠত তবে সেটা একান্তই মহান আল্লাহর জন্য হতো। আর যদি কান্নার পরিবর্তে মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠত তবে সেটাও কেবল তার রবের সৌজন্যেই হতো। একারণেই তার জীবনের প্রতিটি আচরণ, উচ্চারণ এমনকি মৌন আচরণও আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। মহান আল্লাহ বলেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।[১]

কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তির কান্নাকাটি দেখে কারও মনে দয়ার উদ্রেগ হয় না; বরং ভণিতা মনে হয়। মানুষের কাছে এ ধরনের কান্না মূল্যহীন; কিন্তু উন্নত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কান্না ছিল খাঁটি। হৃদয় নিংড়ানো। চোখ জুড়ানো। তার কান্নার প্রভাব ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তার কান্না সাহাবীদের হৃদয়ে গিয়ে আঘাত করত। তাই নবীজিকে কাঁদতে দেখলে তারাও কেঁদে ফেলতেন। তিনি যখন মিম্বরে দাঁড়িয়ে পুনরুত্থান দিবসের বর্ণনা দিতেন তখন কেঁদে ফেলতেন। তার কান্নাবিজড়িত সকরুণ বর্ণনায় সাহাবীগণও কাঁদতেন। তাদের কান্না গুমোট মেঘের মতো মসজিদময় গুঞ্জরিত হতো।

একই ভাবাবেগ সবাইকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। কেউ-ই এই কান্নার প্রভাব এড়াতে পারত না; আবেগ সামলাতে পারত না।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কান্না মানুষকে ছুঁয়ে যেত। কারণ, তার হৃদয়ে ছিল আল্লাহর প্রতি সর্বোচ্চ ভয় ও সীমাহীন ভালোবাসা। কাজেই তার অশ্রুর প্রতিটি ফোঁটা যেন কথা বলে উঠত। প্রেম ও ভয়ের পাঠ দিত। অশ্রুর এই নীরব পাঠ বাগ্মী বক্তাদের সাহিত্যপূর্ণ ভাষণের চেয়েও বেশি আবেদনময় হতো। বেশি হৃদয়গ্রাহী হতো।

হে আল্লাহ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবাদের আমাদের সালাম পৌঁছে দিন।

---

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ২১

প্রাণজুড়ানো হাসি

সুন্দর হাসি হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ দিয়ে দেয়। কঠোর পরিশ্রমের পর মনে স্বস্তি এনে দেয়। হাসিতেই স্বভাবের অভিপ্রকাশ ঘটে। খাঁটি ও পবিত্র হৃদয়ের পরিচয় মেলে। কাজেই মনে স্থিরতা আনতে এবং চারপাশে আনন্দ বিলাতে হাসির কোনো বিকল্প নেই।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে প্রবেশ করে পরিবারের সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন। কখনো হাস্যরসপূর্ণ গল্প বলে শোনাতেন। নিজেও শুনতেন। তার উপস্থিতি ছিল সবার জন্য আশীর্বাদ। কথা ছিল মধুময়। ব্যবহার ছিল অমায়িক। আর কেনই-বা এমন হবে না? তিনি তো প্রেরিত-ই হয়েছেন মানবজাতির শান্তি ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে। কাজেই তার হাসিতে কল্যাণের বারিধারা বর্ষিত হতো।

আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোনো ব্যক্তির কল্যাণময় হাসি ও সদাচারের সবচেয়ে বড় হকদার হলো তার পরিবার ও কাছের মানুষ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। কাজেই যারা সব সময় তার হাসিমুখ দেখে চোখ জুড়িয়েছে; হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসায় বিমোহিত হয়েছে এবং মনোমুগ্ধকর আচরণে প্রীত ও কৃতজ্ঞ হয়েছে—তাদের চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান আর কে হতে পারে?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রিয়জনের মনোরঞ্জনের জন্য কখনো কখনো কৌতুক করতেন। কৌতুকের সময় খেয়াল করতেন, বিষয়বস্তু মজার হলেও যেন তাতে মিথ্যের অনুপ্রবেশ না ঘটে। কাজেই তিনি যা-ই বলতেন, সত্য বলতেন। কাউকে হাসানোর জন্যও তিনি কোনো দিন মিথ্যের আশ্রয় নেননি। মমতাময়ী মা

যেমন পরম যত্নে সন্তানদের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, সাহাবীগণ ঠিক সেই মমতা খুঁজে পেতেন তার পবিত্র ও স্নেহসিক্ত হাসিতে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এমন আচরণে তারা খুঁজে পেতেন নব উদ্যম। নতুন তেজে, নতুন শক্তিতে তাদের দেহ-মন ভরে উঠত।

আল্লাহর শপথ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মজলিসে কেউ কোনো পার্থিব চাওয়া-পাওয়ার জন্য উপস্থিত হতো না। আল্লাহ ও তার রাসূলে সন্তুষ্টি ছাড়া কারও মনে কোনো সুপ্ত বাসনা থাকত না। তার কাছে গেলে স্বর্ণ-রৌপ্য, হীরা-জহরতের মালিক হওয়া যাবে—এই আশায় কেউ তার কাছে যেত না; বরং স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপস্থিতিই ছিল তাদের সবচেয়ে বড় চাওয়া—পরম পাওয়া।

জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ বাজালী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'এমনটা কোনো দিন হয়নি যে, আমার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেখা হয়েছে, অথচ তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসেননি।'

উল্লেখ্য যে, জারীর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন নির্মল হাসি। হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা ও অফুরন্ত উচ্ছ্বাস। তার কাছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখের একটুখানি হাসিই ছিল সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত কিছুর চেয়ে বেশি মূল্যবান। এর চেয়ে মূল্যবান স্মৃতি আর কিছুই হতে পারে না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখের এই এক চিলতে হাসি জারীর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্তরকে পূর্ণ করে দিত। হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ তুলত। প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই হাসির মূল্য সমকালীন সকলেই অনুভব করত।

প্রিয় পাঠক, চাইলে আপনিও এর মূল্য উপলব্ধি করতে পারবেন। একটু কল্পনা করুন তো, আপনার পরমপ্রিয় কোনো ব্যক্তি অথবা জগদ্বিখ্যাত কোনো ব্যক্তিত্ব আপনার সাথে দেখা করতে এসেছেন। তিনি এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে কথা বলছেন। আপনাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন—আপনি এখন কতটা খুশি হবেন! নিশ্চয় এই আশ্চর্যজনক ঘটনা আপনার স্মৃতির পাতায় চিরকালের জন্য অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পার্থিব-জীবনে সফল সাধারণ একজন মানুষের সাক্ষাতেই যদি আপনার এই অবস্থা হয়—তবে একবার ভাবুন তো, বিশ্ব জাহানের পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল যদি আপনার সাক্ষাতে আসে এবং আপনার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে

থাকে তখন আপনার অবস্থা কেমন হবে? প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাক্ষাতে জারীর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অবস্থাও ঠিক এমনই হয়েছিল। কাজেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাসি-কেন্দ্রিক তার অভিব্যক্তি মোটেও অত্যুক্তি নয়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসি-ঠাট্টা, ক্রীড়া-কৌতুক—সব কিছুতেই ছিলেন মধ্যপন্থী। তার স্বভাব ছিল ভারসাম্যপূর্ণ। তার অবস্থা ওই বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মতো ছিল না; যার মুখে সারাক্ষণ মেকি হাসি লেগে থাকে, যে-জীবনকে গুরুত্বের সাথে না নিয়ে সারাক্ষণ খেল-তামাশায় মত্ত থাকে। হাসির সময়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসতেন। কান্নার সময়ে কাঁদতেন। রেগে যাবার মতো অবস্থা হলে রাগান্বিত হতেন। তবে কখনোই অট্টহাস্যে লিপ্ত হতেন না। তার হাসিতে ঠোঁট ঈষৎ প্রকম্পিত হতো; কিন্তু শরীর কাঁপত না। অধিকন্তু তিনি বলেন—

❝

لَا تُكْثِرُوا الضَّحِكَ ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

হাসির ব্যাপারে সাবধান। অবশ্যই অতিরিক্ত হাসির কারণে অন্তর মরে যায়।[১]

তিনি সাহাবীদের সাথে রহস্য করতেন। একবার এক ব্যক্তি এসে তার কাছে নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার কাছে আরোহণের উপযোগী একটি উট চাই।' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'এই মুহূর্তে আমি তোমাকে কেবল উটের একটি বাচ্চাই দিতে পারব।' নবীজির এই কথায় হতাশ ও মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে লোকটি চলে যেতে উদ্যত হয়। এমন সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে পেছন থেকে ডেকে বলেন, 'সব উট-ই তো কোনো-না-কোনো উটের বাচ্চা।'

আরেক দিনের ঘটনা। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবা-পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। এমন সময় এক বৃদ্ধা এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার জন্য জান্নাতের দুআ করুন। তখন আল্লাহর রাসূল বলেন—'কোনো বৃদ্ধা জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' এ কথা শুনে বৃদ্ধা কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং একবুক হতাশা নিয়ে ফিরে যেতে থাকেন। এমন সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু

[১] *মুসনাদে আহমাদ* : ৮০৩৪; *জামি তিরমিযী* : ২৩০৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৪২১৭, হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ডেকে বলেন, আপনি কি মহামহিম আল্লাহর এই ঘোষণাটি শোনেননি—

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ۝ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ۝ عُرُبًا أَتْرَابًا ۝

আমি জান্নাতী রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের করেছি চিরকুমারী[১]। কামিনী, সমবয়স্কা।[২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাসি ছিল রবের প্রতি তার আনুগত্যেরই বহিঃপ্রকাশ। তিনি কখনো কোনো দিন আমাদের অনেকের মতো অযথা, অকারণে হাসেননি। একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরের উদ্দেশ্যে তার বাহনের পিঠে সওয়ার হন। অতঃপর এই দুআ পড়েন—

“

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

হে আল্লাহ, আমার পাপরাশি ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া আর কোনো ক্ষমাকারী নেই।’

দুআটি পড়েই তিনি হাসতে শুরু করেন। তার এই অসংলগ্ন হাসি দেখে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আপনি হাসছেন যে?।’ উত্তরে তিনি বলেন—‘যখন কোনো বান্দা বলে—‘হে আল্লাহ, আমার পাপরাশি ক্ষমা করুন। আপনি ছাড়া আর কোনো ক্ষমাকারী নেই।’ তখন আল্লাহ হেসে দিয়ে বলেন—‘আমার বান্দা জানে, আমি ছাড়া আর কোনো ক্ষমাকারী নেই।[৩]

একদা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের জাহান্নাম থেকে নাজাত পাওয়া শেষ ব্যক্তির গল্প শোনাচ্ছিলেন। সেই ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে প্রতিনিয়ত একটু একটু করে আল্লাহর কৃপা ও অনুকম্পা চাইতে থাকবে। এমন করতে করতে একসময় লোকটি জানতে পারবে যে, আল্লাহ তাকে চাহিদার চেয়েও

---

[১] নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, জান্নাতে প্রবেশের আগে বৃদ্ধাদেরও কুমারী বানানো হবে। এরপর জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

[২] সূরা ওয়াকিয়া, আয়াত : ৩৫-৩৭

[৩] *মুসনাদে আহমাদ* : ৯৩২, *সুনানু আবি দাউদ* : ২৬০২, *সুনানু তিরমিযী* : ৩৪৪৬

দশগুণ বেশি নিয়ামত দান করতে যাচ্ছেন। এই কল্পনাতীত সুসংবাদে সে হতবিহ্বল হয়ে পড়বে এবং মহান আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলবে, 'এই বিশাল আশা দেখিয়ে আপনি কি আমার সাথে মশকরা করছেন? অথচ আপনি বিশ্বচরাচরের একমাত্র প্রভু।' এই ঘটনা বলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসতে শুরু করেন।

মহান আল্লাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সর্বদা সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন। এর ফলে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় অবস্থার প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। খুশির সময়ে কিংবা অবসরে হাস্যরস করতে পছন্দ করতেন। দ্বীনের কথা বয়ান করার সময় গাম্ভীর্য বজায় রাখতেন। আল্লাহর ভয়ে ও ভালোবাসায় চোখ দুটো সজল হয়ে উঠত। সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন সম্মানিত ও আশীর্বাদপুষ্ট। এ কারণে তার হাসি-কান্না, আনন্দ-বিনোদন এবং উপদেশ-দান ও সতর্কীকরণ—সব কিছুই উম্মাহর অনুসরণীয় সুন্নাহ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তার জীবনের প্রতিটি অধ্যায় হাদীসে বর্ণিত ও সংরক্ষিত হয়েছে। তার পবিত্র হাসিও সংরক্ষণ-নীতির আওতার বাইরে পড়েনি। হাদীস সংকলকগণ শুধু তার হাসির ধরন ও কারণ জানার জন্য প্রয়োজনে শত শত মাইল পাড়ি দিতেন। সংকলকগণের এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও ভালোবাসার কারণে তার হাসি পর্যন্ত দলীলে লিপিবদ্ধ হয়েছে—যা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কাছে সমাদৃত ও অনুসৃত।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মর্যাদা এতটাই সমুন্নত করেছেন যে, তার ক্রীড়া-কৌতুক ও হাসি-আনন্দের গল্পগুলোও সংকলক ও বর্ণনাকারী পরম্পরায় এমনভাবে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, যেন আমরা বুঝতে পারি—হাস্যোজ্জ্বল থাকাটা আমাদের ওপর রীতিমতো আবশ্যক! হে মহান রাব্বুল আলামীন, যতদিন পর্যন্ত ভোরে সূর্য উদিত হবে, সন্ধ্যায় অস্ত যাবে; ততদিন পর্যন্ত প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার-পরিজন এবং তার সাহাবী ও অনুসারীদের ওপর অনবরত শান্তি বর্ষণ করুন।

নবীজির বীরত্ব

দৈহিক গঠনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন একজন সামর্থ্যবান সুপুরুষ। বীরত্ব ও অসম সাহসিকতা তার পৌরুষ আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। তিনি আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করতেন না। তার সময়কালে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ ও দুঃসাহিসক ব্যাপার। যুদ্ধ ও যুদ্ধের পরিণতি সব সময় ভয়ঙ্কর হলেও তৎকালের যুদ্ধ ছিল সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর। কেননা, তখন যোদ্ধারা একে অপরের দিকে দূর থেকে গুলি ছুঁড়ে মারত না; বরং উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে সম্মুখযুদ্ধে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। যুদ্ধে গর্দান কাটা পড়ত। তলোয়ারের আঘাতে হাত-পা ঝুলে থাকত। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। তাদের শরীরে, কাপড়ে, বর্মে রক্তের দাগ লেগে থাকত—রক্তের বন্যায় ময়দান ভেসে যেত।

এরকম অবস্থায় স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, সে বীর না হয়ে পারে না। আমাদের প্রাণপ্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শৈশবেই এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। পরিণত বয়সে বহু যুদ্ধে সম্মুখে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শত্রুর ভয়ে কখনোই লুকিয়ে থাকেননি। সহযোদ্ধাদের ঢাল বানিয়ে নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেননি; বরং অধিকাংশ যুদ্ধেই সম্মুখসারিতে অবস্থান নিয়েছেন। সহযোদ্ধাদের পেছনে ফেলে শত্রুবাহিনীর কেন্দ্রীয় শক্তিতে আঘাত হেনেছেন।

তার সাহসিকতা প্রমাণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, তিনি কোনো দিন রণক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেননি। এমনকি পশ্চাদপদও হননি। যখন অন্যরা শত্রুর তীব্র আক্রমণে কয়েক কদম পিছু হটে রক্ষণশীল হয়ে উঠত, তখনও নবীজি সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন স্থানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। শত্রুপক্ষকে এক ইঞ্চি মাটিও ছেড়ে দিতেন না।

কখনো কখনো তিনি বাহিনীর মধ্যভাগে থেকে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করতেন। যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে সৈন্যদের দিক-নির্দেশনা দিতেন; কিন্তু যুদ্ধ যখন ভয়াবহ রূপ নিত, চারিদিকে রক্তের স্রোত বইতে শুরু করত; একের পর এক লাশ পড়তে থাকত, যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ কোনো দিকে মোড় নেওয়ার উপক্রম হতো, তখন বীরবিক্রমে বাহিনীর একদম সম্মুখে গিয়ে যুদ্ধ করতেন। তার স্নায়ু থাকত নির্ভার। আল্লাহর ওপর ভরসা থাকত অবিচল।

আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে করে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকালে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গুহায় আশ্রয় নেন। তারা তখন নিরস্ত্র। ওদিকে বাইরে অপেক্ষমাণ মুশরিকদের হন্তারক-বাহিনী। তাদের হাতে ছিল কোষমুক্ত তরবারি। চোখেমুখে ছিল রক্তের লাল নেশা। এ অবস্থায় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর চেহারায় ভয়ের ছাপ দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে ওঠেন, 'হে আবু বকর, এমন দুই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার কী ধারণা—যাদের তৃতীয়জন হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ?।'[১] চরম বিপদের মুহূর্তে এমন অভয়বাণী উচ্চারণ করা নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত সাহসিকতার অভিপ্রকাশ।

হুনাইন-যুদ্ধে প্রথম দিকে মুসলিম-বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। মাত্র ছয়জন সাহাবী তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে অবস্থান করে যুদ্ধ চালিয়ে যান। একটি খচ্চরের পিঠে চড়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুবাহিনীর দিকে ধাবিত হতে থাকেন। অথচ শত্রুবাহিনী ছিল সংখ্যায় প্রচুর—অস্ত্রশস্ত্র ও লৌহবর্মে সুসজ্জিত। এতদসত্ত্বেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দিকে ছুটে যান এবং একমুষ্টি বালু নিয়ে শত্রুদের দিকে নিক্ষেপ করে বলেন—'তোমাদের চেহারাগুলো কুৎসিত হয়ে যাক।'[২]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৩৬৫৩, ৪৬৬৩; *সহীহ মুসলিম* : ২৩৮১; হাদীসটি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] *সহীহ মুসলিম* : ১৭৭৭; হাদীসটি সালামাহ ইবনু আমর ইবনি আকওয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর ইচ্ছায় তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ নতুন দিকে মোড় নেয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ছুঁড়ে মারা বালুর প্রতিটি কণা শত্রুবাহিনীর প্রত্যেকের চোখে ঢুকে যায়। তারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। যে যে-দিকে পারে ছুটতে থাকে। মুহূর্তেই মুসলিম যোদ্ধারা ময়দানে ফিরে আসে এবং আল্লাহ তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন।

তার প্রশংসায়

আমরা এখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনের সেইসব মুহূর্তের কথা জানব, যখন তাকে নিয়ে প্রশংসা করা হয়েছে। মানুষ হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন, সে-পরিচয় তার নামেই পাওয়া যায়। আরবীতে, 'মুহাম্মাদ' শব্দটি দ্বারা 'মাহমুদ' বোঝানো হয়; যার অর্থ—'প্রশংসনীয়।' আর তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই এমন ছিল—যার প্রশংসা না করে থাকা অসম্ভব। পবিত্রতা, মহানুভবতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সত্যনিষ্ঠা যেন তার নামের সাথেই জড়িয়ে আছে এবং এটাই হবার ছিল। কারণ, স্বয়ং মহান আল্লাহ তার গুণকীর্তন করতে গিয়ে বলেন—

তিনি নিজে প্রশংসিত এবং প্রশংসিত স্থানের অধিকারী। কুরআনের ভাষায়—

عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

খুব সম্ভব আপনার পালনকর্তা আপনাকে প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করবেন।[১]

মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি নাম—যা নূরের হরফে ঈমানের কালিতে মুমিনদের বুকের ভেতর খোদাই করে লিখে দেওয়া হয়েছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রশংসা তাওরাত এবং

[১] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৭৯

ইঞ্জিলেও স্থান পেয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পূর্ববর্তী নবীগণও নিজ অনুসারীদের শেষ-নবী হিসেবে তার নাম জানিয়ে গেছেন। পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহেও তার আগমনের আগাম বার্তা দেওয়া হয়েছে।

ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা থেকে অবমুক্ত। কুরআনের ভাষায়—

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ

তোমাদের সঙ্গী পথভ্রষ্ট হননি এবং বিপথগামীও হননি।[১]

কুপ্রবৃত্তির তাড়না থেকে পবিত্র। কুরআনের ভাষায়—

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

আর তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না।[২]

ধর্মীয় প্রাণপুরুষ ও শরীয়তপ্রণেতা। কুরআনের ভাষায়—

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

কুরআন ওহী বিশেষ—যা তাকে প্রত্যাদেশ করা হয়।[৩]

আল্লাহমুখী ও সত্যের অভিসারী। কুরআনের ভাষায়—

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ

অতএব, আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করুন। নিশ্চয় আপনি সত্য ও স্পষ্ট পথে আছেন।[৪]

---

[১] সূরা নাজম, আয়াত : ২

[২] সূরা নাজম, আয়াত : ৩

[৩] সূরা নাজম, আয়াত : ৪

[৪] সূরা নামল, আয়াত : ৭৯

সুমহান চরিত্রের অধিকারী। কুরআনের ভাষায়—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।[১]

কোমল হৃদয় ও ক্ষমাপরায়ণ। কুরআনের ভাষায়—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল-হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি কঠিন ও রুক্ষ-হৃদয় হতেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করুন। তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।[২]

মহান বিজয়ী। কুরআনের ভাষায়—

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

নিশ্চয় আমি আপনাকে দান করেছি সুস্পষ্ট বিজয়।[৩]

ক্ষমাপ্রাপ্ত। কুরআনের ভাষায়—

لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

যাতে আল্লাহ আপনার অতীত ও ভবিষ্যত-ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন।[৪]

[১] সূরা কালাম, আয়াত : ৪
[২] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৯
[৩] সূরা ফাতহ, আয়াত : ১
[৪] সূরা ফাতহ, আয়াত : ২

সরল পথের পথিক ও পথপ্রদর্শক। কুরআনের ভাষায়—

وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন।[১]

কষ্ট লাঘবকারী। কুরআনের ভাষায়—

وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

তিনি তাদের থেকে লাঘব করেন গুরুভার। অপসারণ করেন শৃঙ্খল।[২]

শান্তির দূত। কুরআনের ভাষায়—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ।[৩]

বস্তুত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অনুগ্রহ ও অনুকম্পার মূর্তপ্রতীক। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, শাসক-শাসিত—সবার প্রতিই তিনি অসামান্য অনুগ্রহ করেছেন। সবার জন্য যথোপযুক্ত মর্যাদা নিশ্চিত করেছেন। প্রত্যেককে তার যোগ্যতা ও সুবিধা-অসুবিধা অনুপাতে বিধান দিয়েছেন। অবস্থাভেদে ইবাদাতের স্বতন্ত্র পথ বাতলে দিয়েছেন। আর কেনই-বা তা হবে না? তাকে যিনি শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি তো অনুগ্রহের আধার—মহান রাব্বুল আলামীন।

বৃদ্ধদের জন্য তিনি ছিলেন আল্লাহর বিশেষ রহমত—কষ্ট লাঘবকারী। কারণ, তিনি বৃদ্ধ ও দুর্বলদের ইবাদাতের সহজ উপায় বলে দিতেন—যাতে শেষ বয়সে এসে ইবাদাত তাদের কাছে দুর্বহ মনে না হয়; ইবাদাতকে বোঝা মনে করে তারা দূরে সরে

---

[১] সূরা শূরা, আয়াত : ৫২

[২] সূরা আরাফ, আয়াত : ১৫৭

[৩] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭

না যায়। অধিকন্তু বৃদ্ধদের প্রতি তার নির্দেশ ছিল—তারা যেন জীবনের শেষ সময়গুলো এমনভাবে কাজে লাগায় যেন এগুলোই হয় তাদের শেষ, অথচ শ্রেষ্ঠ ইবাদাত।

যুবকদের জন্যও তিনি ছিলেন আল্লাহর বিশেষ রহমত—উত্তম আদর্শ। কারণ, তিনি তাদের উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি ও নীতি-নৈতিকতা দিয়ে সাজাতে চাইতেন। তাদের অমূল্য যৌবনকে কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহ দিতেন। পথ ও পন্থা বাতলে দিতেন। তাদের জন্য উজ্জ্বল ও নিরাপদ ভবিষ্যতের ছক আঁকতেন।

শিশুদের জন্যও তিনি ছিলেন আল্লাহর বিশেষ রহমত—স্নেহ-মমতার অফুরন্ত উৎস। কারণ, তিনি স্নেহ ও ভালোবাসার বন্ধনে তাদের আগলে রাখতেন। যে-সকল শিশু তার ইন্তেকালের পরে জন্ম গ্রহণ করেছে, তাদের জন্যও তিনি চিন্তা করেছেন। নবজাতকের কানে আযান দেওয়া, তাদের সুন্দর নাম রাখা এবং যথাযথভাবে প্রতিপালন করার আদেশের মাধ্যমে তিনি তাদের জন্যও ভালোবাসার অনন্য নিদর্শন রেখে গেছেন।

নারীদের প্রতিও ছিলেন তিনি মহান আল্লাহর বিশেষ রহমত—তাদের সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী। কারণ, তিনিই নারীদের সমাজের অত্যাচার ও বৈষম্য থেকে উদ্ধার করেছেন। দাসত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার আস্বাদ দিয়েছেন। সামাজিক, মানবিক ও বৈষয়িক বৈষম্য দূর করে যথার্থ অধিকার নিশ্চিত করেছেন। তাদের সম্মান ও সম্ভ্রম নিরাপদ করেছেন।

শাসক-শ্রেণির জন্যও তিনি ছিলেন আল্লাহর সুস্পষ্ট অনুগ্রহ—অনুপম দিক-নির্দেশক। কারণ, তাদের জন্য তিনি ইনসাফ-ভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। সমাজ থেকে অবিচার, দুঃশাসন ও দুর্নীতি দূর করার কার্যকর পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। জাতীয় জীবনে দয়া ও সহানুভূতির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাদের জন্য এ জাতীয় কাজকে সহজ করে দিয়েছেন। অধিকন্তু তাদেরকেও এসব অপরাধকর্ম থেকে বিরত থাকার আদেশ করেছেন।

জনসাধারণের জন্যও তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ—করুণার অনিঃশেষ উৎস। কারণ, তিনি তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। সামাজিক মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। সেই সঙ্গে তাদের সীমালঙ্ঘন ও বিদ্রোহের মতো অমার্জনীয় অপরাধের ব্যাপারেও সতর্ক করেছেন। শাসক যতদিন আল্লাহর অনুগত্য করবে, ততদিন অবাধ্য হতে নিষেধ করেছেন। নিঃসন্দেহে তার এই আদেশ-নিষেধ

ও নির্দেশনা একটি শক্তিশালী জাতি গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এজন্যই তিনি বিশ্বমানবতার জন্য আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। কুরআনের ভাষায়—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ।[১]

এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, কপট লোকদের কথা মানুষ কানে তোলে না; কিন্তু সৎ লোকদের কথা তারা হৃদয়ের কান দিয়ে শ্রবণ করে। তাহলে কল্পনা করুন, স্বয়ং আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথাগুলো তার অনুসারীদের ওপর কেমন প্রভাব ফেলতে পারে! নিঃসন্দেহে তার মুখ নিঃসৃত বাণী মানুষের অন্তরের অন্তঃস্তলে পৌঁছে যেত। সাহাবীগণ তার কথা হৃদয়ের কোমল ভূমিতে খোদাই করে রাখতেন। তিনি যখন কথা বলতেন, তারা অবনত মস্তকে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করতেন। তার সম্মানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন, দেখে মনে হতো তাদের মাথায় বুঝি কোনো পাখি এসে বসেছে। তাই তারা নড়াচড়া করছেন না—পাছে পাখিটি যদি উড়ে যায়!

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বাভাবিক কথাই এতটা হৃদয়গ্রাহী ছিল। আর যখন তিনি বয়ান করতেন, তখন যেন মিম্বর কেঁপে উঠত। শ্রবণকারীদের হৃদয় জাগ্রত হতো। সমস্ত মনোযোগ তার প্রতি নিবদ্ধ হতো। উপস্থিত সবাই পার্থিব-জীবনের মায়া-মোহ অতিক্রম করে আধ্যাত্মিকতার অপার্থিব জগতে হারিয়ে যেত। হৃদয়ের গভীরে আখিরাতের বাস্তবতা বাঙময় হয়ে উঠত। তাদের চোখের পাতা ভিজে উঠত। মনে হতো, এই বুঝি মৃত্যুর দূত এসে তাদের জান নিয়ে যাবে।

শুধু মানুষ কেন—নিষ্প্রাণ পাথরও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়ান শুনে ভয়ে কেঁপে উঠত। মাটির দেওয়ালও ডুকরে কেঁদে উঠত এবং এটাই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, মহান আল্লাহ তাআলা বলেন—

[১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭

أَفَمِنْ هَٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۝ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝

তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ? হাসছ? কিন্তু ক্রন্দন করছ না?[১]

দৃঢ়চেতা যোদ্ধা। কুরআনের ভাষায়—

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের যিম্মাদার নন...[২]

উল্লেখ্য যে, যুদ্ধের পরিস্থিতি যত বেশি ভয়ংকর হতো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহসিকতাও সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেত। কারণ, তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস করতেন, মৃত্যু তার জন্য অবধারিত। তবে আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতি ব্যতীত মৃত্যু তার কিচ্ছুটি করতে পারবে না। অধিকন্তু মহান আল্লাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে মৃত্যুর বাস্তবতা এভাবে তুলে ধরেছিলেন—

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ

আর মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ কিছু নন! তার পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়েছেন। তাহলে তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসারণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসারণ করে, তবে সে আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ তাদের সাওয়াব দান করেন।[৩]

[১] সূরা নাজম, আয়াত : ৫৯,৬০
[২] সূরা নিসা, আয়াত : ৪
[৩] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৪৪

সীমাহীন বদান্য। হাদীসের ভাষায়—

“

والذى نفسى بيده ، لو أن لى بعدد عضاة تهامة مالا لأنفقته ثم لا تجدونى بخيلا ولا جبانا ولا كذبا

যদি আমার কাছে তিহামার বৃক্ষরাজি পরিমাণ সম্পদ থাকত তবে আমি সেগুলো অকাতরে দান করে দিতাম। তোমরা আমাকে কিছুতেই কৃপণ, মিথ্যেবাদী অথবা ভীরু ভাবতে পারতে না।[১]

বস্তুত বদান্যতায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ছাড়িয়ে যাওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। কারণ, বাস্তবজীবনে সবাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজের কাছে কিছু-না-কিছু অর্থ রেখেই দেয়! কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো দিনই এমনটি করেননি; অভাবের ভয়ে সম্পদ জমা করেননি।

আল্লাহর প্রতি তার আস্থা এতটাই দৃঢ় ছিল যে, তিনি জানতেন, আল্লাহই তাকে খাওয়াবেন, পরাবেন এবং দেখভাল করবেন। তাই তিনি সর্বক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মাত্রায় বদান্যতা দেখাতে পেরেছেন। তার বদান্যতার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হলো সময়। কারণ, তিনি জীবনের পুরোটা সময়ই ইসলামের জন্য বিসর্জন দিয়েছেন। সময়ের সাথে সাথে সম্পদের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন অতুলনীয় দানশীল। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি নিজের জন্য কিছুই সংরক্ষণ করতেন না; বরং নিজের নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসও অকাতরে বিলিয়ে দিতেন। জীবনের ব্যাপারেও তিনি ছিলেন নির্মোহ দাতা। এজন্য সব সময় সামনের সারিতে থেকে যুদ্ধ করতেন। মৃতুভয় উপেক্ষা করে আল্লাহর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকতেন।

হাতিম তাঈ-ও দানশীল ছিলেন। তবে তিনি এর বিনিময়ে খ্যাতি ও ভালোবাসা চাইতেন; কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দান ছিল শুধুই এবং শুধুই আল্লাহকে খুশি করার জন্য। এজন্য তার এই দান ও বদান্যতা অন্যদেরও প্রবলভাবে আলোড়িত করত।

---

[১] *মুআত্তা মালিক* : ৯৭৭, *আল-কামিল লিবনি আদি* : ৩/৯৭

পরম ক্ষমাশীল। কুরআনের ভাষায়—

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

অতএব, আপনি পরম সৌজন্যের সাথে তাদের ক্ষমা করুন।[১]

কোনোরকম বিনিময়ের আশা ছাড়াই তিনি তার অধিকার ক্ষুণ্ণকারীকে ক্ষমা করে দিতেন। এতে সামান্য অনুযোগও করতেন না। সবচেয়ে পাষাণ হৃদয়ের শত্রুকেও তিনি তার ক্ষমা ও সদ্ব্যবহারে পরম বন্ধু ও সেবাদাসে পরিণত করতে পারতেন।

স্বজাতি ও স্বগোত্রের অনেকেই তাকে নবী হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। তার প্রচার করা বার্তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অধিকন্তু তাকে 'মিথ্যেবাদী' ও 'জাদুকর' বলে বয়কট করেছে। একাধারে তের বছর তার ওপর অকথ্য নির্যাতন করেছে। একপর্যায়ে তাকে প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছে। সর্বোপরি দীর্ঘ সময় ধরে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। অথচ এত কিছুর পরেও দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। মক্কা বিজয়কালে তাদের উদ্দেশ্যে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বলেছেন, 'যাও, তোমাদের মুক্ত করে দেওয়া হলো।'

তার এই উদারতা ও মহানুভবতা ঠিক কোন পর্যায়ের ছিল সেটা তার এই কথার মাধ্যমেই অনুধাবন করা যায়। একদা সদাচার ও সম্পর্ক রক্ষার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'অবশ্যই যারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহ আমাকে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে আদেশ করেছেন। যারা আমার সাথে অন্যায় করে তাদের ক্ষমা করে দিতে বলেছেন এবং যারা আমাকে বঞ্চিত করে, তাদের দান করার নির্দেশ দিয়েছেন।'[২]

কুরআনে যে-সকল সুন্দর গুণের কথা বলা হয়েছে, তার সবই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাস্তব জীবনে ধারণ করেছিলেন। এজন্যই আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা তার সম্পর্কে বলেছেন—

[১] সূরা হিজর, আয়াত : ৮৫

[২] *মিশকাতুল মাসাবীহ* : ৫৩৫৮; *তাফসীরে কুরতুবী* : ৭/৩৪৬

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

কুরআন হচ্ছে তার চরিত্র।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারও সাথে কোনো ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে যে-কোনো উপায়ে তা পালন করতেন। তার শত্রুরা পর্যন্ত বলতে পারবে না যে, তিনি কোনো দিন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন অথবা কোনো চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন। তার চরিত্রের খুঁত ধরার জন্য এবং আচরণের ভুল বের করার জন্য শত্রুরা সারাক্ষণ তার পিছে লেগে থাকত। অথচ শত চেষ্টার করেও তারা তার কোনো ত্রুটি বা ভুল খুঁজে বের করতে পারেনি।

শান্তি কিংবা যুদ্ধে, খুশি কিংবা ক্রোধে, উদ্বেগ কিংবা নির্ভার সময়ে—সর্বাবস্থায়ই তিনি সত্যবাদিতা এবং বিশ্বস্ততার ওপর অবিচল ছিলেন। একবার তার সাথে এক লোকের নির্দিষ্ট একটি স্থানে সাক্ষাৎ করার কথা ছিল। তিনি সময়মতো সেখানে উপস্থিত হন; কিন্তু লোকটি আর আসে না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ভেবে সেখানে তার জন্য তিন দিন অপেক্ষা করেন যে, লোকটা হয়তো এসে তাকে খুঁজবে এবং না পেয়ে ভীষণ কষ্ট পাবে। এমনই ছিলেন আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এমনই ছিল তার বিশ্বস্ততা!

বিভিন্ন সময় ও পরিস্থিতিতে তিনি ইহুদী ও মুশরিকদের সাথেও চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। যদিও এই দুই দল সারা জীবন তার বিপক্ষে লড়ে গেছে, তবুও তিনি কোনো দিন সন্ধির একটি কথাও এদিক-সেদিক করেননি। প্রতিশ্রুতি রক্ষায় তিনি ছিলেন আপসহীন। তার পক্ষে এই পর্যায়ের বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা প্রদর্শন খুবই স্বাভাবিক ছিল। কারণ, তিনি যে-সত্যনীতি মেনে চলতেন, যে-শরীয়ত অনুযায়ী জীবন-যাপন করতেন, তা বিবেচনায় আনলে মানুষের চরিত্র এমন সুউচ্চ হওয়াটাই স্বাভাবিক। তিনি মিথ্যের আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। চুক্তি ও অঙ্গীকার ভঙ্গের ব্যাপারে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। তিনি বলেছেন—

[১] প্রাগুক্ত

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি—কথা বললে মিথ্যে বলে, অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে, আমানত রাখা হলে খিয়ানাত করে।[1]

অধিকন্তু মহান আল্লাহর পক্ষ হতে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে দেওয়া নির্দেশনায় তাকে বলা হয়েছে—

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

এবং অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[2]

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ

এরা এমন লোক, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে। অঙ্গীকার ভঙ্গ করে না।[3]

অতএব, যে-মহান সত্তা দয়া, ক্ষমা, কল্যাণকামিতা ও অন্য সকল মানবিক গুণে অনন্য—কেনই বা তার প্রশংসা করা হবে না?

[১] সহীহ বুখারী : ৩৩/২৬৮২; সহীহ মুসলিম : ৫৯, হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৩৪

[৩] সূরা রাদ, আয়াত : ২০

নবীজির বাগ্মীতা

وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِىٓ أَنفُسِهِمْ قَوْلًۢا بَلِيغًا

তাদের সদুপদেশ দিন এবং এমন কথা বলুন যা তাদের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে।[১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়ান যে শুনেছে, সে জানে কতটা বিস্ময়কর আলংকারিক ছিল তার বয়ান। আল্লাহর শপথ, এখনো তার উদ্ধৃতি এক নিমিষেই মানুষের হৃদয়কে বন্দী করে ফেলে। তার শব্দচয়ন, বাক্যবিন্যাস, উপস্থাপনা শৈলী এবং পরিমিতি বোধ মানুষকে বিমুগ্ধ করে। তার বক্তব্য সুসংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ। সংক্ষিপ্ত বাক্যে ও পরিমিত শব্দে তিনি গভীর বার্তা দিতে পারতেন। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেন—

"

أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ

আমাকে সারগর্ভ বাণী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[২]

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৬৩

[২] *সহীহ বুখারী* : ২৯৭৭; *সহীহ মুসলিম* : ৫২৩; হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অপর এক হাদীসে বলেন—

“

وَاخْتَصَرَ لِيَ الْكَلَامَ اخْتِصَارًا

আমাকে সবচেয়ে বলিষ্ঠ ভাষাজ্ঞান দিয়ে ধন্য করা হয়েছে।[১]

বস্তুত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা ছিল একদম মেদহীন ও বাহুল্যমুক্ত। তবুও হাদীসে উল্লিখিত তার উদ্ধৃতিগুলো জীবনের সব বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ইহকাল-পরকাল, অতীত-বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সব কিছুর বর্ণনাই আমরা সেখানে পাই। কেউ যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যিকার বাগ্মীতা ও ভাষার সৌন্দর্যকে অনুধাবন করতে যায়, তাহলে অন্য যে-কারও সাথে তার কথা তুলনা করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে—বড় বড় কবি-সাহিত্যিকের ভাষাও তার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। কেউ যদি কোনো গবেষকের উদ্ধৃতিসমৃদ্ধ বই পড়তে যায়, তাহলে পরিষ্কার দেখতে পাবে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণী ও বক্তব্য সেখানে আলো ছড়িয়েছে এবং নিঃসন্দেহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উদ্ধৃত বাণী সেই বইয়ের মান ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিয়েছে। আর যদি তার কথাগুলোকে কোনো সুবক্তার সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, তাদের কথায় সামান্য হলেও কৃত্রিমতা ও বাহুল্য আছে, আর খুব বেশি হলে গড়পড়তা মানের।

অশিক্ষিত লোক, যে-কোনো দিন কোনো বই বা সাহিত্য পাঠ করেনি—এমন ব্যক্তি থেকে শুরু করে কবি, সাহিত্যিক, বিদ্বান, বিজ্ঞ শিক্ষক—সবাইকে যদি একত্র করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কিছু বাণী শোনানো হয়, তাহলে এদের সবাই একসাথে মুগ্ধ হবে। সমানভাবে তাদের হৃদয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভালোবাসার জালে আটকা পড়বে।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে কিছু উপদেশ দেবেন বলে মনোস্থির করেন। তিনি তাকে এমনভাবে বলতে চেয়েছিলেন, যেন তা একই সাথে সংক্ষিপ্ত ও জ্ঞানগর্ভ হয়। তাই তিনি বললেন—

---

[১] *বায়হাকী, শুআব* : ১৪৩৬; উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; *কাশফ আল খফা* : ১/১৪-১৫

“

اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

যেখানেই থাকো, আল্লাহকে ভয় করো। মন্দ কাজ করলে সাথে সাথে একটি ভালো কাজ করো। পরের কাজটি আগেরটাকে মুছে দেবে। আর মানুষের সাথে মিশলে উত্তম ও সদয় আচরণ করো।[১]

যে যত বড় বাকপটুই হোক না কেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মতো করে সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ কথা বলতে তার যথেষ্ট বেগ পেতে হবে—সারগর্ভ ভাব ধরে রাখতে গেলে, সংক্ষিপ্ততা হারিয়ে যাবে। তাকে এত সময় ধরে কথা বলতে হবে যে, শ্রোতা ধৈর্য ও আগ্রহ দুই-ই হারিয়ে ফেলবে। আবার সময় সংক্ষিপ্ত করতে গেলে অর্থের ভাব-গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যাবে। তখন বাক্য অপচয় কম হলেও অর্থের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হবে না।

একদা উকবা ইবনে আমির রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, মুক্তি কীসে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন—

“

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

জিহ্বায় লাগাম দাও, তোমার ঘরকে তোমার জন্য যথেষ্ট মনে করো এবং কৃতপাপের জন্য ক্রন্দন করো।[২]

প্রিয় পাঠক, লক্ষ্য করুন, জটিল একটি প্রশ্নের উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তাৎক্ষণিক উত্তর তিনটি কতটা সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ! কতটা সুবিন্যস্ত ও অর্থবহ! এই একই প্রশ্ন যদি অন্য কাউকে করা হতো, তাহলে হয়তো সে উত্তরের জন্য দীর্ঘ সময় প্রার্থনা করত, প্রস্তুতি নেই বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত কিংবা এমন একটি উত্তর দিত—যা সংক্ষিপ্ত একটি বাণী না হয়ে, দীর্ঘ একটি বক্তব্য অথবা রচনায় পরিণত হতো। অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো প্রকার পূর্ব প্রস্তুতি ও লিখিত বক্তব্য ছাড়াই তাৎক্ষণিক, অথচ কত সুন্দর, অর্থবহ

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ* : ২০৮৪৭, ২০৮৯৪; *জামি তিরমিযী* : ১৯৮৭; *সুনানু দারিমী* : ২৭৯১; *মিশকাতুল মাসাবীহ* : ৫০৮৩

[২] *মুসনাদে আহমাদ* : ২১৭৩২, *জামি তিরমিযী* : ২৪০৬; ইবনু আবি আসিম, *সহীহ আয-যুহদ* : ১/১৫

ও তাৎপর্যপূর্ণ উত্তর দিলেন। একটা প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য সাধারণ মানুষের যে-প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, তিনি সে-সুযোগই পাননি। কারণ, প্রশ্নকর্তা এখনো তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। উত্তরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

কার্যত এটাই ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা বলার সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য। তিনি যা-ই বলতেন, তাতে কোনোরকম পূর্ব প্রস্তুতি থাকত না। অথচ কথাগুলো হতো নিখুঁত, নির্ভুল ও কালজয়ী। সবচেয়ে পারদর্শী বক্তাদের হাতে যদি সংলাপপত্র নাও থাকে তবুও তাদের কিছু-না-কিছু পূর্বপরিকল্পনা বা প্রস্তুতি থাকেই। কেউই হঠাৎ করে মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে একদম নির্ভুল, সংক্ষিপ্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলতে পারে না। অথচ দিনের পর দিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কাজটি নিখুঁতভাবে করে গেছেন। অবশ্য এটা মোটেও আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয়। কারণ, তিনি যা বলতেন সব আসমানী জ্ঞানের আলোকে বলতেন।

একবার তিনি এবং ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু একসাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন—

“

يَا غُلَامُ، إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسأَلِ الله ، وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِن اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحفُ واعلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبرِ ، وأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الكَرْبِ ، وأَنَّ معَ العُسْرِ يُسراً

আমি তোমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিচ্ছি—আল্লাহর হক ও অধিকার রক্ষা করবে, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন। তার অধিকার রক্ষা করে চললে, দুঃসময়ে তুমি তাকে পাশে পাবে। কিছু চাইলে কেবল আল্লাহর কাছেই চাইবে। সাহায্য প্রার্থনা করলেও কেবল তারই কাছে প্রার্থনা করবে। আর মনে রেখো, যদি গোটা মানবজাতি তোমাকে সাহায্য করতে জড়ো হয়, তবুও আল্লাহ তোমার জন্য যা লিখে রেখেছেন তার বাইরে গিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে না। অনরূপভাবে গোটা জাতি যদি তোমাকে ক্ষতি করতে উদ্যত হয় তবুও আল্লাহ তোমার জন্য যা লিখে রেখেছেন তার বাইরে গিয়ে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে, লেখার কালি শুকিয়ে গেছে। আর জেনে নিয়ো, ধৈর্যের সাথেই রয়েছে বিজয়। দুঃখের সাথেই রয়েছে মুক্তি এবং কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি।[১]

[১] মুসনাদে আহমাদ : ২৬৬৪, ২৭৫৮, ২৮০০; জামি তিরমিযী : ২৫১৬; মুসতাদরাকে হাকিম :

কলেবরে কত ছোট্ট একটি কথা। অথচ এর অর্থ কত গভীর ও ব্যাপক! হাদীসের এই কথাগুলো মনে রাখার জন্য যথেস্ট সংক্ষিপ্ত। অথচ এর মর্ম ধারণ করলে জীবনের সকল সমস্যা সহজেই সমাধান হয়ে যাবে; গুনাহ পরিহার করা সম্ভবপর হবে এবং জীবনকে সুখ ও নিরাপত্তার চাদরে মুড়িয়ে নেওয়া যাবে—শুধু মনে রাখতে হবে— 'আল্লাহর হক ও অধিকার রক্ষা করবে, আল্লাহ তোমাকে রক্ষা করবেন।'

এত গুরুত্বপূর্ণ ও জীবনঘনিষ্ঠ একটি উপদেশ—এর চেয়ে অল্প কথায় ব্যক্ত করা অন্যকারও পক্ষে সম্ভব নয়। উপদেশটির অবশিষ্ট অংশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই সারগর্ভ বাণীর সৌন্দর্য বুঝতে হলে অবশ্যই আরবী ভাষাজ্ঞান থাকতে হবে এবং মূল আরবী বক্তব্য সামনে রাখতে হবে।

এই হাদীসের মতো অন্যান্য হাদীসেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথার কারুকাজ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রতিটি শব্দ যথাস্থানে এমনভাবে বসানো হয়েছে যে অন্য কিছু দ্বারা এর প্রতিস্থাপন সম্ভব নয়। একটি বাক্যেও কোনো প্রকার কৃত্রিমতা বা একঘেয়েমির ছোঁয়া নেই; বরং শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাক্যের প্রতিটি শব্দ ও কাঠামো জুড়ে রয়েছে অনন্য সাবলীলতা। এজন্য তার কথাগুলো সংক্ষিপ্ত; তবে সারগর্ভ। সরল; কিন্তু সুশোভিত। অতীতের অনেক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি হাদীস বর্ণনাকারীদের ত্রুটি দেখে নয়; বরং কোনো কথিত হাদীসের বর্ণনা ও শব্দচয়ন দেখেই হাদীসের দুর্বলতা নির্ণয় করতে পারতেন।

তারা এত এত হাদীস অধ্যয়ন করেছেন যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিখুঁত বচনভঙ্গির সাথে তারা একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তারা বুঝে গিয়েছিলেন যে, দুর্বল কোনো বাক্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখ থেকে বের হতে পারে না।

একটি হাদীসে আছে—

"

প্রতিটি কাজের ভালোমন্দ নিয়তের ওপর নির্ভর করে। মানুষ কাজের পূর্বে যে-নিয়ত করে তা-ই সে প্রাপ্ত হয়।[১]

৬৩০৪, হাদীসটি ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; *মিশকাতুল মাসাবীহ* : ৫৩০২

[১] *সহীহ বুখারী* : ১/৫৪; *সহীহ মুসলিম* : ১৯০৭; হাদীসটি উমার ইবনে খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর

সরল ও সংক্ষিপ্ত এই কথাটি শুধুই একটি বাণী নয়। এর সাথে ইসলামে মৌলিক বিশ্বাস—রীতি-নীতি ও বিধি-বিধান সংযুক্ত রয়েছে। বাক্যের সংক্ষিপ্ততা অর্থের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি; বরং জ্ঞানীদের জন্য তা হয়ে উঠেছে উপদেশ। সময়ের সাথে এটা হয়ে উঠেছে গবেষকদের মূলনীতি এবং কবি-সাহিত্যিকদের জন্য প্রায়শ ব্যবহার করা উদ্ধৃতি।

দুঃখের সময়ে মানুষের মনকে কথার দ্বারা স্বস্তি প্রদানের এক আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর। তিনি এমন কিছু বলতেন—যাতে দুশ্চিন্তা দূরীভূত হয়, ভারাক্রান্ত মনও স্বস্তি ফিরে পায়। কখনো কখনো তিনি সংক্ষিপ্ত কথায় সুর-ছন্দও সৃষ্টি করতেন। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'সকল নবীর ভেতর আমাদের নবী হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নীতির অধিকারী। আমার একজন ভাই ছিল। নাম ছিল আবু উমাইর। যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এসেছিলেন খুব সম্ভবত তখন আবু উমাইর সদ্য মায়ের দুধ ত্যাগ করা শিশু ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে উমাইর, 'কোথায় তোমার নুগাইর?।'

'নুগাইর' অর্থ ছোট পাখি। তাই পাখিটির নামের সাথে শিশুটির নামের ছন্দ মিলিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু উমাইরকে খুশি করতে চেয়েছিলেন। কারণ, তার পোষা পাখিটি মারা যাওয়ায় সে অনেক দুঃখ পেয়েছিল।'[১]

এতে কোনোই সন্দেহ নেই যে, কথার কারুকাজে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সেরাদের সেরা। আর সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব কুরআন তো তারই ওপর নাযিল হয়েছে—যার পূর্ণতা, মহিমা এবং ভাষার ব্যাপ্তি, গভীরতা ও মাধুর্য সমগ্র আরবকে করে ফেলেছিল বাকরুদ্ধ।

সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬১২৯, ৬২০৩; *সহীহ মুসলিম* : ২১৫০, হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

সমাধান প্রদান

আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলেন—

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ

তারা আপনার কাছে জানতে চায়। আপনি বলুন, আল্লাহ তোমাদের জানান দিচ্ছেন।[১]

যে-কোনো জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি চাইলেই ফতোয়া জারি করতে পারে না। মুফতী বা বিচারক হতে গেলে কিছু বিশেষ দক্ষতা ও গুণাবলির প্রয়োজন হয়। জ্ঞান সেগুলোর একটি গুণ মাত্র, একমাত্র গুণ নয়। মুফতী ও বিচারককে অবশ্যই বিচক্ষণ, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও তীক্ষ্ণ ধীসমৃদ্ধ হতে হবে। প্রত্যেক অবস্থার প্রেক্ষিতে আলাদা আলাদা ব্যবস্থাগ্রহণের প্রস্তুতি থাকতে হবে। প্রশ্নকর্তার বক্তব্য অনুধাবন করতে হবে। এ ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহ তাআলা তার স্বীয় রহমত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পাণ্ডিত্য এবং অন্যান্য সুন্দর ও প্রয়োজনীয় গুণাবলি দ্বারা তাকে করেছিলেন সুসজ্জিত। যখন বিভিন্ন মানুষ তার কাছে একই রকম অনুরোধ বা প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতো, তিনি সবার জন্য একই কথার পুনরাবৃত্তি করতেন না; বরং এমনভাবে উত্তর দিতেন—যা প্রশ্নকর্তার ইহকাল ও পরকাল—উভয় ক্ষেত্রেই উপকারে আসে।

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১২৭

যখনই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে কেউ কোনো প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতো তিনি তার প্রেক্ষিতে এমন সব উত্তর দিতেন, যেন প্রশ্নকারীর চিন্তাধারা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আদ্যপান্ত সব তিনি মুখস্থ করে এসেছেন। এটা সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক তার ওপর বর্ষিত রহমত ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রশ্নকারীর জবাব তিনি এমনভাবে দিতেন যে, দুরূহ সমস্যারও সমাধান হয়ে যেত। প্রশ্নকারী অমুসলিম হলে মুসলিম হওয়ার প্রেরণা লাভ করত। মোটকথা, তিনি এমন উপদেশই দিতেন, যাতে প্রশ্নকর্তা সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে পেত।

একবার এক দুর্বল বৃদ্ধলোক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে উপস্থিত হয়ে কিছু উপদেশ চাইলেন। তার বয়স ও দুর্বলতার কারণে তিনি বেশিক্ষণ সালাত পড়তে পারেন না। সিয়াম রাখতে পারেন না। অন্যান্য ইবাদাত-ও তেমন করতে পারেন না। হজ তো ছিল তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাই তিনি এমন ইবাদাতের সন্ধান করছিলেন, যাতে সামান্য পরিশ্রমে অসামান্য পুরস্কার পাওয়া যায়।

প্রশ্ন করার সময় এতকিছু তিনি উল্লেখ না করলেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিকই তার অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি অতি সংক্ষেপে বললেন, 'আল্লাহর যিকিরে আপনার জিহ্বা যেন সব সময় আর্দ্র থাকে।'[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে লোকটিকে এমন কিছু করতে দেননি, যাতে তার হাত-পায়ের ব্যবহার করতে হয় বা ভারী কিছু উঠাতে হয় কিংবা অনেক পথ অতিক্রম করতে হয়; বরং যা তিনি করতে বললেন, তার জন্য সর্বোচ্চ জিহ্বা সঞ্চালন করতে হবে। কাজটি যেমন সহজ, তেমনই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বলার ভাব ও ভাষাও সহজ। তাই অতি সহজেই এটা মনে রাখা সম্ভব। এই একই প্রশ্ন যদি অন্য কাউকে করা হতো, তাহলে হয়তো সে এই বৃদ্ধ লোকটিকে এমন এমন কাজ করতে বলত—যা তার এই রুগ্ন শরীরে পালন করা একদমই সম্ভব হতো না।

এটা ছিল বৃদ্ধ লোকের প্রতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপদেশ। এখন তাহলে শক্ত-সমর্থ যুবকদের প্রতি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপদেশ সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক। একদা গাইলান আস-সাকাফী রাযিয়াল্লাহু

[১] *মুসনাদে আহমাদ* : ১৭২২৭, ১৭২৪৫; *জামি তিরমিযী* : ৩৩৭৫; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৭৯৩; *মিশকাতুল মাসাবীহ* : ২২৭৯

আনহু নামের এক সুপুরুষ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আল্লাহর নিকটবর্তী হবার উপায় জানতে চান। নবীজি বৃদ্ধকে দেওয়া উপদেশের মতো এবারও সংক্ষিপ্ত, অথচ অর্থপূর্ণ ও সহজেই মনে রাখার মতো দেন; কিন্তু এই উপদেশটি আগেরবারের মতো অতটা সহজ ছিল না। পেশীবহুল গাইলান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তিনি বলেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ করো।' তাই শক্তি ও সামর্থ্যের কথা চিন্তা করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম সৈন্যশিবিরে তার নাম লেখান। আর ইসলামের শত্রুদের বিপক্ষে যুদ্ধে অংশ নেওয়ার নির্দেশ দেন।

আরেকবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু উপদেশ চেয়েছিলেন। তাকেও কি তিনি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে কিংবা আল্লাহর যিকিরে জিহ্বা সর্বদা আর্দ্র রাখতে বলেছিলেন? নাহ, দুটোই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় কাজ, তবে প্রশ্নকর্তার প্রশ্ন শুনেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পেরেছিলেন যে, কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তিনি জানতে চাচ্ছেন। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন—'রাগান্বিত হয়ো না।'[১] এই ভিন্নধর্মী উপদেশের কারণ এই ছিল যে, আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রকৃতিগতভাবেই রাগী স্বভাবের ছিলেন। কাজেই ঠিক এরকম একটি উপদেশই আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহুর প্রয়োজন ছিল। কারণ, এ উপদেশ ঠিকমতো পালন করতে পারলে তার এবং আশেপাশের সবার জীবনেই এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

তাছাড়া সরল অথচ গভীর এই উপদেশটি যে শুধু আবু যরেরই উপকার করে থেমে গেছে—তা কিন্তু নয়; বরং আরও অনেকেরই তা কাজে এসেছে এবং এটা ইসলামের মৌলিক একটি নীতিতে পরিণত হয়েছে।

একবার আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে পর্বতে আরোহণ করতে দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'বলো—উচ্চারণ—লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ—আল্লাহ ছাড়া কারও কোনো মৌলিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নেই'। কারণ, এই কথাটি জান্নাতের অমূল্য সম্পদ।'[২]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬১১৬; হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] *সহীহ বুখারী* : ৪২০৫, ৬৬১০; *সহীহ মুসলিম* : ২৭০৪; হাদীসটি আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

এখন কথা হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে কেন এই উপদেশ দিলেন? কারণ, তিনি এমন একটি কাজ করছিলেন—যাতে প্রচণ্ড শক্তি ও প্রচেষ্টার প্রয়োজন—যা আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়। তাছাড়া নিজের কর্তৃত্ব আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়ে যে বিনম্রভাবে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে, আল্লাহর সাহায্য তাকে সঙ্গ দেয়। অধিকন্তু আল্লাহই সর্বশক্তিমান। একমাত্র সাহায্যকারী।

আল্লাহর বিশেষ রহমতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের দক্ষতা ও সামর্থ্য বুঝতে পারার এক আশ্চর্য ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। যে-মানুষটা যে-কাজের যোগ্য, তিনি তাকে সেই কাজটিই দিতেন। উদাহরণস্বরূপ, হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু-র কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি একজন ভালো মানের কবি ছিলেন। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইসলামের স্তুতি গেয়ে কবিতা লিখতে উৎসাহিত করেন। তিনি যাতে সিদ্ধ নন, তার ভার তাকে দেওয়া হয়নি। তাকে বলা হয়নি যে, লোকেদের বিবাদ মিটিয়ে দাও। বিচার করা তার বিশেষত্ব নয়—দেখে তাকে সেই দায়িত্বও দেওয়া হয়নি।

যে-সাহাবী অন্যদের থেকে বিচক্ষণ, তাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিচারকার্যে নিয়োগ দিতেন। যিনি শারীরিকভাবে সবল তাকে তিনি সেনাশিবিরে যোগদান করতে বলতেন। যার ভেতর নেতৃত্ব প্রদানের গুণ ছিল তাকে তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করতেন। আবার যে-সাহাবীর আচার-ব্যবহার ভালো, তাকে তিনি ইসলামী শিক্ষাদানে উৎসাহিত করতেন। যেমন, মুসআব ইবনু উমাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে মদিনাবাসীর ইসলামী জ্ঞান শেখানোর আদেশ করেছিলেন।

এভাবে যোগ্যতা বুঝে তিনি সবাইকে কাজে লাগাতেন। অধিকন্তু তাদের স্বভাববিরুদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকার জন্য সাবধানও করে দিতেন। যেমন আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু অনেক বিষয়েই পারদর্শী হলেও নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সঠিক ব্যক্তি ছিলেন না। হয়তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, তার ভেতর সহিষ্ণুতা ও অন্যান্য নেতাসুলভ আচরণের ঘাটতি রয়েছে। তাই আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে তিনি নেতৃত্বগ্রহণে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। তিনি আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাপারে অনেক খেয়াল রাখতেন। তাই এমন কোনো দায়িত্ব তার ওপর অর্পণ করতে চাননি, যা তিনি বহন করতে অপারগ। কেননা, পুনরুত্থান দিবসে দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হওয়ার হিসেবও দিতে হতে পারে।

ইসলামে নেতৃত্ব বিশেষ কোনো সুবিধা বা অধিকার নয়; বরং বিরাট দায়িত্বকে নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার শামিল—যার হিসেব আল্লাহর কাছে দিতে হবে। এ থেকেই বোঝা যায়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতটা সুবিবেচনার সাথে সাহাবীদের বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করেছিলেন এবং এটাই হওয়ার ছিল। কারণ, তার সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

কুরআন ওহী—যা তাকে প্রত্যাদেশ করা হয়।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে ইয়েমেনে প্রেরণ করার সময় জানিয়ে দেন—

“

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

তুমি এমন জাতির কাছে যাচ্ছ—যারা আহলে কিতাব—তথা ইহুদী ও নাসারা।[২]

তাকে এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যাতে তিনি বুঝতে পারেন তাকে কাদের কাছে পাঠানো হচ্ছে এবং কোন উপায়ে তাদের উপদেশ দিলে তারা তা গ্রহণ করতে পারে এবং হেদায়েত পেতে পারে।

একবার গাধার পিঠে সওয়ার অবস্থায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয ইবনু জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে বান্দার প্রতি আল্লাহর হক এবং আল্লাহর প্রতি বান্দার হকের ব্যাপারে বোঝাচ্ছিলেন। সব কিছু তিনি সবিস্তারে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। কারণ, মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু শুধু একজন জ্ঞানী ব্যক্তিই নন; বরং তাকে দাওয়াতের কাজে অন্যদের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছিল। তিনি একই সাথে একজন শিক্ষক, পথপ্রদর্শক এবং একজন বিচারক ছিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি গাধার পিঠে অন্য কারও সাথে থাকতেন, যেমন ধরা যাক কোনো বেদুঈনের সাথে যাত্রা করতেন, তবে তাকে এত বিস্তারিত উপদেশ দেওয়া কোনো ফল বয়ে আনত না। অবশ্যই তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওই ব্যক্তির উপযোগী কোনো উপদেশই প্রদান করতেন।

---

[১] সূরা নাজম, আয়াত : ৪

[২] *সহীহ বুখারী* : ১৪৫৮, ১৪৯৬; *সহীহ মুসলিম* : ১৯, ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

একদা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে হুসাইন ইবনে উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু গমন করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কয়জন দেবতার পূজা করো?।' হুসাইন জবাব দেন, 'আমি সাতজনের পূজা করি। একজন আকাশে থাকে। আর ছয়জন যমীনে থাকে।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এরপর জিজ্ঞাসা করেন, 'এদের মধ্য থেকে কার ব্যাপারে তুমি আশা ও ভয় পোষণ করো?।' উত্তরে তিনি বলেন, 'যে আসমানে থাকে, তার ব্যাপারে।' একথা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তাহলে যমীনের দেবতাদের পরিহার করে শুধু আসমানে যিনি আছেন তারই ইবাদাত করো।' এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'বলো—

"

اللَّهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي

হে আল্লাহ, আমাকে সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং আমাকে আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন।[১]

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে আসার আগে হুসাইন ইবনু উবাইদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সত্য থেকে অনেক দূরে ছিলেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। তাই তার অবস্থার প্রেক্ষিতে এই দুআ ছিল খুবই প্রাসঙ্গিক ও অত্যন্ত কার্যকর।

আরেকবার আলি ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'বলো'—

"

اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي

হে আল্লাহ, আমাকে হিদায়াত দান করুন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করুন।[২]

---

[১] *জামি তিরিমিযী* : ৩৪৮৩; *লালকাঈ* : ১১৮৪; হাদীসটি ইমরান ইবনু হুসাইন রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; *মিশকাতুল মাসাবীহ* : ২৪৭৬

[২] *সহীহ মুসলিম* : ২৭২৫

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর অবস্থার প্রেক্ষিতে এই দুআ ছিল যথোপযুক্ত। কারণ, তিনি অন্যান্য সাহাবীদের চেয়ে যথেষ্ট দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন। তিনি এমন যুগ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন যখন ফিতনার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল এবং সত্যকে মানুষের কাছ থেকে গোপন করা হচ্ছিল। তাই দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দিক নির্দেশনা চেয়ে কঠিন মেঘাচ্ছন্ন সময়ে আলোর পথ দেখতে পাওয়াটা তার জন্য জরুরি ছিল।

সুতরাং, সকল প্রশংসা আল্লাহর—যিনি তার রাসূলকে সত্য, সুন্দর ও চিরকল্যাণের পথ দেখিয়েছেন। তিনি স্বীয় দয়াগুণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মানুষের যোগ্যতা বিচার করার জ্ঞান দান করেছেন, তার মাধ্যমে তাদের যথার্থ ও সর্বোত্তম উপদেশ প্রদান করেছেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবিদের পছন্দ করতেন না। কারণ, সাধারণত কবিরা যা জানে না তাই নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে। উদ্দেশ্যহীনভাবে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। শব্দের কল্পরাজ্যে বিচরণ করে। তাদের মনগড়া কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে তারা যা বলে, তা শুনলে বাস্তবতা বিবর্জিত অনেক কিছুই মনের আয়নায় ভেসে ওঠে। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব অসার কথা ও কল্পনাবিলাস অপছন্দ করতেন। নিজেকে এ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখতেন। অন্যদেরকেও নিরুৎসাহিত করতেন। নিজে সত্যভাষণ দিতেন। অন্যদেরও সত্যভাষণে উদ্বুদ্ধ করতেন। একারণেই তার প্রতিটি কথা ওহীর মর্যাদা লাভ করেছে।

যে-সকল রাজনীতিবিদ তোষামোদ ও মিথ্যে প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে মানুষের মন রক্ষার চেষ্টা করে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মতো ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন সবার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ, তিনি আল্লাহর প্রেরিত দূত। একজন বিশিষ্ট নবী ও রাসূল—যাকে মহান আল্লাহ আপন ব্যবস্থাপনায় অসৎ কাজ ও অশুভ চিন্তা থেকে পবিত্র ও নিরাপদ রেখেছেন। তিনি এসেছিলেন প্রজ্ঞানির্ভর ও নীতিসমৃদ্ধ সত্য দ্বীনের সংবাদ নিয়ে। তিনি এমন কোনো লেখক, গবেষক বা দার্শনিক ছিলেন না, যাদের জ্ঞান কেবল নিজেদের অভিজ্ঞতা, অন্য লেখকদের মতামত কিংবা দার্শনিকদের চিন্তার ওপর নির্ভর করে; বরং তিনি যা বলতেন, সরাসরি আল্লাহর সূত্রে বলতেন—যিনি জ্ঞান ও সৃষ্টির একমাত্র উৎস।

চারিত্রিক শুচিতা

মহান আল্লাহ বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾

হে নবী, আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি—সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তার দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।[১]

আল্লাহ শুধু তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে যাবতীয় সৎ গুণ দিয়েই থেমে থাকেননি; বরং সে-সকল গুণে সর্বোচ্চ উৎকর্ষ দান করেছেন। যেমন, ধরা যাক—তার দানশীলতার কথা। তিনি শুধু দানশীলই ছিলেন না; বরং দানশীলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই জীবন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অতুলনীয়—অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। সহনশীলতা, নম্রতা, ধার্মিকতা, ন্যায়-নীতি এবং আরও যত সুন্দর গুণাবলি আছে—মানব-ইতিহাসে—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে অধিক মাত্রায় আর কেউ তা ধারণ করতে পারেনি। অন্যরা শুধু নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। যেমন কেউ হয়তো ধৈর্যশীল; কিন্তু দানশীল নয়। সাহসী; কিন্তু ধার্মিক নয়। অথচ একজনের চরিত্রে যতগুলো সুন্দর ও সৎ গুণাবলি ধারণ করা সম্ভব—তার সবই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে ছিল।

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ৪৫-৪৬

আর কেনই বা এমন হবে না—যেখানে স্বয়ং আল্লাহ তাকে মানুষের জন্য আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং তাদের আদর্শ গুণাবলির দিকে পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত দূত হিসেবে চরিত্র ও নৈতিকতার যতটুকু উৎকর্ষ সাধন করার কথা ছিল, তিনি তার সবটুকু করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্যকে শেখানোর আগে নিজের মধ্যে যে-সকল শিক্ষা ও গুণ ধারণ করা প্রয়োজন সেক্ষেত্রেও তিনি অনন্যতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। এক কথায়, সর্ববিচারেই তিনি ছিলেন সৎ, পবিত্র, মহানুভব ও আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত। আল্লাহর ইশারায় তার দেহ থেকে হৃৎপিণ্ড বের করে পরিশুদ্ধ করা হয়েছে। সব ধরনের মন্দ থেকে তা পবিত্র রাখা হয়েছে। তাই তার অন্তর ছিল হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতারণা ও পাপ-প্রবণতা থেকে অবমুক্ত। একারণে অবিসংবাদিতভাবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সবচেয়ে ভদ্র, সজ্জন, মহানুভব ও ধার্মিক সুপুরুষ এবং এটাই হবার ছিল। কেননা, তার সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে—

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

আমি আপনাকে কেবল বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি।[১]

যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যদের ক্রোধ সংবরণের আদেশ করেছেন তখন সবার আগে নিজেই সেটা আয়ত্ত করেছেন। আল্লাহর হক ও অধিকারের প্রশ্ন ছাড়া কখনোই তিনি ক্রুদ্ধ হননি। তাই, একজন রগচটা স্বভাবের মানুষ হিসেবে কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কল্পনাও করতে পারে না; বরং তাকে স্মরণ করা হয় তার সদাচার, সদ্ব্যবহার, সহনশীলতা ও বদান্যতার জন্য। সাহাবীদেরকেও তিনি এই গুণ আয়ত্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। বলেছেন—

“

وَلَا تَحَاسَدُوا

তোমরা একে অন্যকে দেখে বিদ্বেষপরায়ণ হবে না।[২]

---

[১] সূরা আম্বিয়া, আয়াত : ১০৭

[২] *সহীহ বুখারী* : ৬০৬৫, ৬০৭৬; *সহীহ মুসলিম* : ২৫৫৯, হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

নিজেও সর্বাগ্রে ও সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিজের মধ্যে এই গুণ ধারণ করেছেন। মহান আল্লাহ তাকে হিংসা ও ঘৃণা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের দিকে ধাবিত করেছেন। তাকে আপন অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে সাধারণ মানুষকে উপকৃত করেছেন। যে-সমস্ত মানুষ তাকে অভিসম্পাত করত, তিনি তাদেরও উপকার করার চেষ্টা করতেন—যাতে তাদের মনে ইসলামগ্রহণের ইচ্ছা জাগ্রত হয় এবং আল্লাহর দয়ায় জাহান্নামের আগুন থেকে বেঁচে যায়।

সদাচার ও সুসম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা একে অন্যের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করো না।'[১]

উল্লেখ্য যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যকে যে-আদেশ বা উপদেশ দিতেন সেটা আগে নিজে পালন করতেন। কেউ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাইলে তিনি দয়া ও উদারতা দিয়ে তার মন জয় করার চেষ্টা করতেন। কেউ তার প্রতি অবিচার করলে তিনি মাফ করে দিতেন। কেউ তাকে কোনো কিছু থেকে বঞ্চিত করলে, তিনি তাকে মন উজাড় করে দান করতেন। অন্যের ব্যাপারে সব সময় সুধারণা পোষণ করতেন। আত্মীয়-অনাত্মীয় সবার সাথে সদাচার করতেন। একারণে বলা যায়, নিম্নোক্ত আয়াতটি অন্য যে-কোনো ব্যক্তির চেয়ে নবীজির ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য—

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ

...যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে—(তারাই প্রকৃতসদাচারী)।[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

"

إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا

নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে এই মর্মে প্রত্যাদেশ করেছেন যে, তোমরা বিনয়ী ও নিরহংকার হও।[৩]

[১] প্রাগুক্ত

[২] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৩৪

[৩] সহীহ মুসলিম : ২৮৬৫; হাদীসটি ইয়ায ইবনু হুমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

এজন্যই তিনি বিনয় ও বিনম্রতার আদর্শ ছিলেন এবং এজন্যই তাকে মহান আল্লাহ মর্যাদার উচ্চাসনে আসীন করেছিলেন। অনুসারীদের ভালোবাসায় সিক্ত করেছিলেন। অনুসারীরা তাকে মানব ও মানবতার জনক হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এসব গুণাবলি ও মর্যাদা সত্ত্বেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জুতা নিজেই সেলাই করতেন। মাটিতে বসতেন। ভেড়ার দুধ দোহন করতেন। গরীবদের সাহচর্যে থাকতেন। ঘোড়ায় আরোহণ না করে গাধার পিঠে চড়তেন। দুর্বল ও বয়স্কদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। ছোট ও অধিকার বঞ্চিতদের প্রতিও অনুগ্রহ দেখাতেন। আপন-পর সবার প্রতিই সমান সদাচার করতেন। একারণেই তিনি বলতে পেরেছেন—

“

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রী ও পরিবারের কাছে সর্বোত্তম। আর আমি আমার স্ত্রী-পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রীগণ উল্লেখিত হাদীসটির স্বপক্ষে বিভিন্ন বয়ানে সাক্ষ্য দিয়েছেন। স্বামী হিসেবে উৎকর্ষের শীর্ষ চূড়ায় উন্নীত হলে একজন মানুষ যতখানি মহান হতে পারে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক ততখানি মহান ছিলেন। তিনি যখন তার স্ত্রীদের কাছে যেতেন, তাদের সুন্দর হাসি উপহার দিতেন। তাদের সাথে হাসি-কৌতুক করতেন। ঘরের কাজে সাহায্য করতেন। স্ত্রীদের সাথে তার কথোপকথন ছিল অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। কখনো খারাপ বা কর্কশ আচরণ না করে ধীর-স্থির এবং খোশ মেজাজে কথা বলতেন। তার এই অসামান্য ঔদার্যের স্বীকৃতি দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন—

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী।[২]

---

[১] *সুনানু তিরমিযী* : ৩৮৯৫; *বায়হাকী, আস-সুনান* : ১৫৪৭৭, হাদীসটি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।।

[২] সূরা কালাম, আয়াত : ৪

বস্তুত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিচার এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই তার অন্তরের পবিত্রতার পরিচায়ক। বিচারকার্যে কে বাদী, আর কে বিবাদী—তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাননি। রায় যদি তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এমনকি নিজের বিপক্ষেও যেত, তবুও তিনি তা কার্যকর করা থেকে পিছপা হতেন না। রায় প্রদানে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিলেন। তবুও অনেক মূর্খ ও স্বার্থান্বেষী লোক তাতে সন্তুষ্ট হতো না।

একবার এক লোক তাকে বলেছিল, ‘আপনি ইনসাফ করুন।’ নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসূলকে এধরনের উপদেশ দেওয়া ছিল চরম হঠকারিতার শামিল। তবুও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চরম সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে তাকে আক্রমণ করেননি; বরং বিনয়ের সাথে কেবল এতটুকু বলেছেন যে, ‘আমি যদি ইনসাফ না করি তবে আমি অবশ্যই ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবো। তাছাড়া আমিই যদি ইনসাফ না করি, তাহলে আর কে করবে?’[১]

আসলেই তো! স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সঠিক বিচার না করেন, তাহলে এ ব্যাপারে ভরসা করার মতো তারচেয়ে উত্তম আর কে আছে? মানুষের মধ্যে একমাত্র নবীজিই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই হচ্ছেন সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ। কাজেই তিনি যদি ন্যায়বিচার না করতেন, তাহলে পৃথিবী থেকে ন্যায়-নীতি এবং সকল আশা-ভরসা উঠে যেত। যখন তাকে ওই ব্যক্তি রুক্ষভাবে ন্যায়বিচার করতে বলেছিল, তখনও তিনি ওই ব্যক্তির প্রতি ন্যায়বিচারই করেছিলেন। ন্যায়পরায়ণতা যদি রক্ত-মাংসে গড়া কোনো সত্তা হতো এবং তাকে ভাষাজ্ঞান দেওয়া হতো তবে তার নাম হতো ‘মুহাম্মাদ’—সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

কারও অন্তরে যদি ব্যাধি থাকে তাহলে সে অপরিচিত দুই ব্যক্তির মধ্যে যথাযথ বিচার করতে পারলেও যখন তাকে পরিচিত মানুষদের বিচারের ভার দেওয়া হবে তখন সে তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে নির্ঘাত বেইনসাফী করে বসবে। এদিক থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হৃদয় ছিল স্বচ্ছ ও নির্মল—সকল মন্দের উর্ধ্বে। কাজেই নিজের এবং স্বজনদের স্বার্থ বলি দিয়ে হলেও তার মুখ থেকে সত্য রায় ছাড়া আর কিছুই প্রকাশ পায়নি। তিনি একবার বলেছিলেন যদি চুরি করতে গিয়ে তার নিজের কন্যা ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহা-ও ধরা পড়ে, তবুও শাস্তি হিসেব তার হাত কাটা যাবে।

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৩৬১০; *সহীহ মুসলিম* : ১০৬৩; হাদীসটি আবু সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

মানুষের প্রতি অন্যায় আচরণ আল্লাহর রাসূলের পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না। তবুও যদি তার মনে হতো যে, অজ্ঞাতসারে কারও প্রতি অন্যায় হয়ে গেছে তাহলে তিনি নিজে গিয়ে এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করতেন। ক্ষমা চাইতেন এবং যথাযথ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করতেন। অথচ এখন মানুষ কত জঘন্য অপরাধ করেও পার পেয়ে যায়! এর কারণ, তাদের সাথে এমন ব্যক্তিবর্গের যোগাযোগ আছে—যারা দেশের নেতা, যুবরাজ, সাংসদ, কিংবা শিল্পপতি। একই অপরাধে একজন সাধারণ নাগরিক যেখানে বছরের পর বছর কারাভোগ করে, সেখানে একজন যুবরাজের আত্মীয় নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়ায়। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবদ্দশায় এর ঠিক বিপরীত চিত্র দেখা যেত।

কুরাইশ বংশের বনু মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরির অপরাধে ধরা পড়ে। তাই স্বাভাবিকভাবেই তার হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়। তখন কুরাইশেরা এই শাস্তি ঠেকাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন উসামা ইবনু যায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর শরণাপন্ন হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি ওই মহিলার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে কথা বলতে রাজী হন। যখন তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তার অভিপ্রায়ের কথা বলেন, তখন রাগে তার চেহারা রক্তবর্ণ ধারণ করে। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও আহত স্বরে বলেন, 'তুমি কি আল্লাহর আইনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাচ্ছ?'

সাথে সাথে ভুল বুঝতে পেরে উসামা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলে ওঠেন, 'হে আল্লাহর নবী, আমার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন।'[১]

আরেকবার যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু ও একজন আনসারী একটি ব্যাপারে মীমাংসার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত হয়। বিচারের রায় যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর পক্ষে যাওয়ায় আনসারী ব্যক্তি বলে ওঠে—'যুবায়ের রাযিয়াল্লাহু আনহু আপনার ফুফাতো ভাই দেখে আপনি তার পক্ষে রায় দিয়েছেন!' তখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়—

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৩৪৭৫, ৬৭৮৮; হাদীসটি উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অতএব, তোমার পালনকর্তার শপথ, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন বলে বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজেদের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা খুঁজে না পায় এবং হৃষ্টচিত্তে তা গ্রহণ করে।[১]

বলাবাহুল্য যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণের জন্য মহান আল্লাহর এই একটি সাক্ষ্যই যথেষ্ট।

অধিকন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শত্রু-মিত্র সকলেই এই ব্যাপারে একমত হতে বাধ্য যে, পৃথিবীতে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়কে প্রতিহত করতেই তার আগমন ঘটেছিল। মক্কার যে-মানুষগুলো তাকে নবী হিসেবে অস্বীকার করেছিল তারাই তাকে নিজেদের জান-মালের ব্যাপারে পরম নির্ভরতার একমাত্র উৎস মনে করত। যে-ইহুদীরা তার প্রচার করা বার্তাকে বর্জন করেছিল, সেই ইহুদীরাই আবার প্রয়োজনের সময় বিবাদ-মীমাংসার জন্য তাকেই বেছে নিত।

বস্তুত মানুষের আত্মিক শুচিতা ও অশুচিতার প্রকাশ ঘটে তার বাহ্যিক আচার-ব্যবহারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মূল্যায়ন করি, তবে দেখতে পাবো যে, তার আচার-ব্যবহার হৃদয়ের কথা বলত। কথায় ও কাজে এবং চিন্তায় ও আচরণে সব সময় মিল পাওয়া যেত। তিনি যা-সত্য, তাই বলতেন। যা বলতেন, তাই সত্য হতো। তার কোনো কথা অসত্য প্রমাণিত হয়নি। তার কোনো ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে প্রতিপন্ন হয়নি। তার কৃত আচরণ ও প্রদত্ত উপদেশের মধ্যে কখনো বিরোধ বা ব্যতিক্রম দেখা যায়নি।

আর যদি বাহ্যিক রূপের প্রসঙ্গে আসি তবে বলতে হয়—তার চেহারা ছিল নূরের শিখা। ত্বক ছিল প্রভাত-সমীরের মতো কোমল। নিঃশ্বাস ছিল মেশকের মতো সুগন্ধ। তার গায়ের সুঘ্রাণ ছিল মৃগনাভীর চেয়েও তীব্র। এমনকি তার শরীরের ঘামও ছিল উজ্জ্বল মুক্তোর মতো জ্বলজ্বলে ও ফুলের রেণুর মতো সুরভিত। আনাস রাযিয়াল্লাহু

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৬৫

আনহু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুরভিত অঙ্গসৌষ্ঠবের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন—

“

مَا شَمَمْتُ عَنْبَرًا قَطُّ، وَلَا مِسْكًا، وَلَا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا مَسِسْتُ شَيْئًا قَطُّ دِيبَاجًا، وَلَا حَرِيرًا أَلْيَنَ مَسًّا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমি কোনো দিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতের মতো নরম ও কোমল রেশম স্পর্শ করিনি এবং তার দেহের বায়বীয় সুঘ্রাণ সর্বোৎকৃষ্ট কস্তুরি বা আম্বরেও পাইনি।[১]

অধিকন্তু তার সাথে হাত মেলানোর কয়েকদিন পর্যন্ত তার গায়ের সুগন্ধ পাওয়া যেত।

বক্র ও অপবিত্র হৃদয়ের মানুষের মুখে হাসির বদলে বিরক্তি থাকে। সঙ্গী হিসেবে এরা মোটেও কাম্য নয়। এরকম মানুষের মেজাজ সারাক্ষণ তিরিক্ষি হয়ে থাকে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অন্তর পরিষ্কার থাকায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত উত্তম একজন সাথী। হাসির কথায় হাসতেন। দুঃখজনক ঘটনায় কাঁদতেন। সান্ত্বনা দিতেন। আবার কারও সাথে দেখা হলে মুচকি হেসে অভ্যর্থনা জানাতেন। মজলিসে কথার যাদুতে সবার মনে শান্তি ও স্বস্তি জোগাতেন। তার কথায় কেউ কোনো দিন বিরক্ত হয়নি। তার সান্নিধ্যে এসে কেউ কখনো ক্লান্তি অনুভব করেনি; বরং যে তার সঙ্গে একবার পরিচিত হয়েছে, সে বারবার তার সান্নিধ্য পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

ঈদের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিপাটি হয়ে বাইরে বের হতেন। তার দীপ্তিময় মুখে সুন্দর একটুকরো হাসি শোভা ছড়াত। ঈদ নিঃসন্দেহে সবার জন্য পরম আনন্দের মুহূর্ত। তবে তার অনুসারীদের কাছে এই আনন্দের চেয়েও বড় আনন্দ ছিল তার সাথে সময় কাটানো এবং তার পাশে বসে তার উপদেশ শোনা। কারণ, তিনি এমন মানুষ ছিলেন—যার দিকে দৃষ্টি গেলেই মহান আল্লাহর কথা মনে পড়ত। যার কথা শোনা মাত্রই হৃদয়ে শান্তির একপশলা বৃষ্টি নেমে যেত।

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৩৫৬১; *সহীহ মুসলিম* : ২৩৩০; হাদীসটি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

তার হৃদয়ের পবিত্রতার নিদর্শন দেখা যেত যুদ্ধের ময়দানেও। কারণ, যার মনে সংশয় বা দুরভিসন্ধি থাকে সে সব সময় মৃত্যুকে ভয় করে। অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি যুদ্ধের ময়দানে শহীদী মৃত্যু কামনা করতেন। সব সময় আপন রবের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকতেন। দুনিয়ার এই জীবনের চেয়ে আখিরাত তার কাছে বেশি মূল্যবান ছিল। তাই তিনি শৌর্য-বীর্যে লড়াই করে যেতেন। একদম সম্মুখভাগে থেকে শত্রুর মোকাবেলা করতেন। কোনো দিন ভয়ে এক পা-ও পিছু হটেননি। এমনকি সবচেয়ে বীর সাহাবীগণও যুদ্ধের ভয়ানক মুহূর্তে শত্রুর মোকাবিলায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পেছনে থেকে লড়াই করতেন। তারা কেবল এটুকু জানত যে, যতক্ষণ তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকটে অবস্থান করবে ততক্ষণ তারা নিরাপদ এবং তাদের বিজয় সুনিশ্চিত।

নবীপ্রেম

মহান আল্লাহ বলেন—

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ

...সুতরাং, যারা তার প্রতি ঈমান এনেছে, তাকে সম্মান করেছে; সাহায্য করেছে এবং সে-নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে (তারাই সফলকাম)।[১]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুমিন হবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান-সন্ততি ও সকলের চেয়ে অধিক প্রিয় হবো।[২]

সাহাবীদের জীবনীকার ও জীবনী-পাঠকমাত্রই জানেন যে, সাহাবীদের কাছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতটা প্রিয় ছিলেন। একজন মানুষ

---

[১] সূরা আরাফ, আয়াত : ১৫৭

[২] *সহীহ বুখারী* : ১৫; *সহীহ মুসলিম* : ৪৪; হাদীসটি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আরেকজন মানুষকে সর্বোচ্চ যতটা ভালোবাসতে পারে, তারা আল্লাহর রাসূলকে ঠিক ততটা ভালোবাসতেন। তাদের এই ভালোবাসা সকল আবেগকে ছাড়িয়ে যেত। এই ভালোবাসার সঙ্গে মাতৃত্ব, পিতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্বের তুলনা করলে তারা মা-বাবা ও স্ত্রী সন্তানের কথা ভুলে যেতেন।

কিন্তু এই হৃদয় উজাড় করা ও সর্বস্ব বিলিয়ে দেওয়া ভালোবাসার কারণ কী ছিল? এই প্রশ্নটা এজন্য গুরুত্বপূর্ণ যে, ইতিহাসে আর কোনো নেতা, শাসক বা সেনাপ্রধান তার অনুসারীদের ততটা ভক্তি ও ভালোবাসা পায়নি; ততটা সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি—যতটা ভক্তি ও ভালোবাসা আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পেয়েছেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু বলেছেন বা করেছেন, অথচ তার সাহাবীগণ জান-প্রাণ দিয়ে তা অনুসরণ করার চেষ্টা করেননি—এমনটা কখনো হয়নি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সকল আদেশ তারা একবাক্যে পালন করতেন। তাকে রক্ষা করার জন্য নিজেদের দেহকে ঢাল বানিয়ে দিতেন। এই ঢাল নিছক জীবনরক্ষার ঢাল ছিল না; বরং সম্মান-রক্ষারও ঢাল ছিল। তাকে তারা এতটাই শ্রদ্ধা করতেন যে, অনেকে তার দিকে তাকিয়ে কথা বলতেও দ্বিধা বোধ করতেন; কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তার একটি মাত্র আদেশে পরদেশে যাত্রা করতে তারা দ্বিধা করতেন না। অধিকন্তু তার আদেশ পালন করতে পেরেই বরং তারা ছিলেন সবচেয়ে খুশি। এতটাই খুশি, যেন তারা শত্রুর মুখোমুখি নয়; বরং নববিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গ পেতে যাত্রা করছেন। আর এভাবেই তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মর্যাদা দিয়েছেন। তার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রচার করা প্রতিটি কথায় তারা নিঃশর্ত ঈমান এনেছেন। সম্ভাব্য সকল উপায়ে নবীজিকে সব কিছুর ওপরে তুলে ধরেছেন। নিজেদের খুশির আগে তার খুশির কথা চিন্তা করেছেন। নিজেরা কষ্ট করে হলেও তার স্বস্তির ব্যবস্থা করেছেন। তারা চাইতেন, নিজেরা না খেয়ে থাকলেও যেন নবীজি অনাহারে না থাকেন।

তারা কখনোই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সামনে উঁচু আওয়াজে কথা বলতেন না। তার চেয়ে উঁচু আওয়াজে তো কিছুতেই নয়। কথা বলার সময় তারা ভক্তি ও ভালোবাসার যৌথ চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখতেন। ভালোবাসাকে সমীহের গাম্ভীর্যে মুড়িয়ে নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতেন।

আল্লাহর রাসূলের সিদ্ধান্তকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। নিজেদের সিদ্ধান্ত তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া তো দূরে কথা; কখনো তার অনুমতি ছাড়া সিদ্ধান্তই নিতেন না। সর্বোতভাবে তাকে ভালোবাসতেন। শালীন ও মার্জিত পন্থায় সেই ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। তার প্রতিটি সুন্নাহ পালনের জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতা করতেন।

নবীজির প্রতি তাদের এই অভূতপূর্ব ভালোবাসার কারণ গুণে শেষ করা সম্ভব হবে না। তবে সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। জিন-ইনসানের হিদায়েতের গুরুদায়িত্ব তার স্কন্ধেই ন্যস্ত ছিল। কারণ, তাকে এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করা হয়েছিল যে, তিনি মানবজাতিকে কুফরের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে ঈমানের আলোতে বের করে আনবেন; পথহারা মানুষকে হাতে ধরে জান্নাতের পথে পরিচালিত করবেন।

সুতরাং, বলা যায়, নবুওয়াতের গুরুদায়িত্বই ছিল তার প্রতি সবার অনন্য ভালোবাসার প্রধান কারণ; তবে এটাই একমাত্র কারণ ছিল না। কারণ, তার সুকুমার গুণাবলি ও অমায়িক ব্যবহারে যে-কেউ তাকে ভালোবাসতে বাধ্য ছিল। তিনি তাদের হৃদয়-ভূমি জয় করেছিলেন—তার হৃদ্যতা ও মহত্ত্ব দিয়ে। তার সাথে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছে, চেতনাকে শানিত করেছে এবং চিত্তকে প্রাণবন্ত করেছে।

কুফর ও জাহিলিয়াতের আঁধার চিরে যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শুভ আগমন ঘটে তখন সাহাবীগণ তাকে আঁকড়ে ধরে প্রশান্তি লাভ করেন। আল্লাহর অনুগ্রহে তিনিই তো তাদের অন্তর থেকে শিরকের কলুষতা বিদূরিত করেছেন, তাদের হৃদয়কে কুফরের পাপাচার এবং নির্জীব মূর্তির উপাসনার লজ্জা থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন; সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের দিশা দিয়েছেন। বিভ্রান্তি আর অশান্তির পরিবর্তে শুদ্ধি ও নিরাপত্তা উপহার দিয়েছেন। যে-হৃদয়-ভূমি সংশয়ের রুক্ষতায় বিরান মরুতে পরিণত হয়েছিল সেই হৃদয়ে তিনি ঈমানের দুর্গ গড়ে তুলেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মাঝে সত্যের বার্তা নিয়ে আগমনের পূর্বে তারা ছিল বন্যপশুর মতো—অজ্ঞ ও উদ্দেশ্যহীন। সততা ও সত্যবাদিতা, আস্থা ও বিশ্বাস, দয়া-দাক্ষিণ্য ও আচার-ব্যবহার এবং নীতি ও নৈতিকতার কোনো বালাই ছিল না তাদের মাঝে—সব কিছু ছিল আলোকশূন্য। অন্ধকার ও হতাশার জীবনে তারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। অনৈতিক কার্যকলাপ, মূর্তিপূজা এবং মদ ও মদিরার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা ছিল তাদের জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ—মর্যাদা ও আভিজাত্যের সর্বোচ্চ প্রতীক।

অন্যায় রক্তপাত ও অন্যের ভূমিদখল ছিল নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার—বীরত্বের পরিচায়ক। সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার জন্য তাদের জীবনে বিশেষ কোনো লক্ষ্য ছিল না। আল্লাহকে তারা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। আর আল্লাহকে উপেক্ষা করে যে-জীবন পরিচালিত হয়, সে-জীবনের কী-ই বা অর্থ থাকতে পারে? আখিরাত সম্পর্কে তারা ছিল ঘোর অন্ধকারে। জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল ভ্রান্ত পথে। মূল্যবান সময় অহেতুক কাজে খরচ করে তারা ধাবিত হচ্ছিল নির্মম মৃত্যুর দিকে।

তাদের হৃদয় হয়ে গিয়েছিল পাথরের চেয়েও কঠিন। আত্মা ছিল রাতের নিকষ অন্ধকারের চাইতেও কালো। জীবনের পবিত্রতা-অপবিত্রতা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। আশেপাশের কিছুই তাদের স্পর্শ করত না। হালাল বা হারাম—কোনো উপার্জনই তাদের কাছে বিশেষ কোনো অর্থ বহন করত না। তারা পরিণত হয়েছিল সম্পূর্ণ ন্যায়-নীতি বিবর্জিত এক জাতিতে।

অবশেষে আল্লাহ তাদের রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেন। তাদের জীবনে আবারও সুখ-সমৃদ্ধি ও সাফল্য ফিরিয়ে দিতে মনোস্থির করেন। তাই তিনি রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে। তার আগমনে পাল্টে যায় সব কিছু—চিন্তা, মনন, ধর্ম, বিশ্বাস, ইতিহাস-ঐতিহ্য সব কিছু। তাদের দেখে তখন মনে হয়, তারা যেন নবজন্ম ও নতুন জীবন লাভ করেছে।

মহামহিম আল্লাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর ওহী নাযিল করেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে ঐশী জ্ঞান ও বিধান প্রেরণ করেন। এই জ্ঞান ও বিধানই তাদের জীবন-বিধান ও সুখ-সমৃদ্ধির প্রধান অবলম্বন হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাই, অনেক অনেক বছর ধরে না-করা সৎকর্ম আবার পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে। মন্দিরের সেবকগণ মসজিদ নির্মাণ করেন। অনর্থক পূজা-পার্বণ বাদ দিয়ে সালাত-সিয়ামে মনোনিবেশ করেন। দাস-শ্রেণিকে মুক্ত করেন।

এক কথায়, তাদের হৃদয়ে জ্ঞানের আলো ও মননে মানবিকতার বীভা জেগে ওঠে। কুরআন হয়ে ওঠে তাদের চর্চা ও অধ্যয়নের মূলবস্তু। তারা এই জ্ঞান শুধু নিজেরা অধ্যয়ন ও চর্চা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এর সংরক্ষণ ও প্রচারেও সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করেছেন। এভাবেই তারা সৃষ্টির দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করেন এবং নিজেদের পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত জাতি হিসেবে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পবিত্র কুরআনে মানুষ ও মানব সমাজের এই ক্রমপরিবর্তনের ধারা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ঘোষণা করেন—

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতোপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।[১]

সাহাবীগণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে খুবই ভালোবাসতেন। কারণ, তার হাত ধরেই তারা আল্লাহকে চিনতে পেরেছেন। তিনিই তাদের আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির ব্যাপারে সংবাদ দিয়েছেন। জাহান্নামের রাস্তা থেকে জান্নাতের পথে তুলে এনেছেন। পার্থিব-জীবনের মায়াজাল থেকে বের করে অনন্ত শান্তির ঠিকানার সন্ধান দিয়েছেন এবং উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

“

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، تُفْلِحُوا

হে লোকসকল, বলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তবেই তোমরা সফলকাম হবে।[২]

সালাতের ব্যাপারে বলেছেন—

“

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

আমাকে যেভাবে সালাত পড়তে দেখেছ, সেভাবে সালাত আদায় করো।[৩]

---

[১] সূরা জুমুআ, আয়াত : ২

[২] *মুসনাদে আহমাদ* : ১৮৫২৫; *মুসতাদরাকে হাকিম* : ৩৯; হাদীসটি রাবীয়া ইবনু আব্বাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৬৩১; হাদীসটি মালিক ইবনুল হুয়ায়রিত রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

হজের ব্যাপারে বলেছেন—

“

لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ

আমার কাছ থেকে তোমরা হজের বিধি-বিধান শিখে নাও।[১]

শুদ্ধি ও তাকওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলেছেন—

“

إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا

তোমাদের মধ্যে আমিই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি এবং তার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানি।[২]

সর্বোপরি সুন্নাহর ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন—

“

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي ، فَلَيْسَ مِنِّي

যে আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে আমার আদর্শের অনুসারী বলে বিবেচিত হবে না।[৩]

বস্তুত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাদেরকে অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা থেকে উদ্ধার করেছেন এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেছেন। এতকিছুর পরও কি সাহাবীগণ তাকে ভালো না বেসে থাকতে পারে? শুধু তারা কেন; মুসলিম জাতিই বা কীভাবে তাকে ভালো না বেসে থাকতে পারে—যেখানে সকল সৎকর্ম ও সুকুমারবৃত্তির একমাত্র আদর্শ তিনিই!

সুতরাং, একজন মুসলিম যখন ওযূ-গোসল, সালাত-সিয়াম, হজ-যাকাত অথবা অন্যকোনো ইবাদাত করতে চায় তখন তাকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে, তার

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ১২৯৭; হাদীসটি জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] *সহীহ বুখারী* : ২০; উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৫০৬৩; *সহীহ মুসলিম* : ১৪০১; আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

নবী এই সকল ইবাদাত কীভাবে পালন করেছেন। তাকেও ঠিক সেভাবেই ইবাদাত পালন করতে হবে। কারণ, একমাত্র নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণেই তার ইবাদাত পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে!

একজন মুসলিম কীভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালো না বেসে থাকতে পারে—অথচ তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, পথ প্রদর্শক এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরম অনুসরণীয়!

একজন মুসলিম কীভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালো না বেসে থাকতে পারে—অথচ তিনি গোটা মানবজাতিকে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের পথে দাওয়াত দিয়েছেন—যে-পথ সততা, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বিচারের পথ!

কীভাবে একজন মুসলিম নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভালো না বেসে থাকতে পারে—অথচ তিনি ছিলেন সুস্পষ্ট সতর্ককারী এবং সব ধরনের মন্দ হতে রক্ষাকারী! অন্যায়, অবিচার, শোষণের বিপক্ষে লড়াই করে কেটেছে তার সারাটা জীবন। সুতরাং, যেদিন থেকে কোনো মুসলিম ইসলামের শিক্ষায় জীবন পরিচালনা শুরু করে এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে, সেইদিনই সে প্রকৃত জন্ম লাভ করে।

পৃথিবীতে একজন মানুষের সুখ-সাফল্য নির্ভর করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনাদর্শ মেনে চলার ওপর। কারণ, কথা ও কাজে একমাত্র তিনিই ছিলেন সত্যপথযাত্রী। অন্যভাবে বললে, তার দেখানো পথে না চললে আমাদের পদস্খলন ঘটবেই। কেননা, সত্য ব্যতীত সমস্ত পথ কেবলই ভ্রান্তির। তাই আমাদের কথায় ও কাজে ঠিক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মতোই হতে হবে। তাকেই একমাত্র আদর্শ হিসেবে মেনে চলতে হবে এবং তার সুন্নাহকেই সকল কাজের মানদণ্ড স্থির করতে হবে।

মহান আল্লাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করে বলেন—

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ
نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

এভাবে আমি আপনার কাছে এক ফেরেশতা প্রেরণ করেছি আমার আদেশক্রমে। আপনি জানতেন না, কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমি একে করেছি নূর, যার দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করি। নিশ্চয় আপনি সরল পথ প্রদর্শন করেন।[১]

[১] সূরা শূরা, আয়াত : ৫২

কল্যাণের আধার

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল্লাহর বরকতে পরিপূর্ণ। তিনি যেখানে যেতেন, সেখানেই বরকত ও কল্যাণের বারিধারা বর্ষিত হতো। শৈশব থেকেই তার এই কল্যাণময়তা মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। তিনি যখন দুধের শিশু তখন হালিমা সাদিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে 'দুধ-শিশু' হিসেবে গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তার সার্বিক অবস্থা পাল্টে যায়। সর্বত্র বরকতের ছোঁয়া দেখা যায়। তার জীর্ণ বুকে দুধ ফিরে আসে। বাহনের গায়ে শক্তি ফিরে আসে। অনুর্বরতার কারণে যখন অন্যদের মেষ ও গবাদি পশু খালি পেটে ফেরে তখনও তার মেষগুলোর পেট ভরা থাকে। ওলান দুধে পূর্ণ থাকে।

তার মুখের কথায়ও অসামান্য বরকত ছিল। তিনি অত্যন্ত জটিল বিষয়ও খুব সহজে ও স্বল্প ভাষায় বোঝাতে পারতেন। তার শব্দের কারিগরি এতটাই অসাধারণ ছিল যে, সর্বস্তরের মানুষ অনায়াসে তার কথা বুঝতে পারত। যে-সকল তাৎপর্যপূর্ণ

---

[১] সূরা মারইয়াম, আয়াত : ৩১

বিষয় বোঝাতে সাধারণ মানুষের কয়েক ঘন্টা লেগে যেত সেগুলো তিনি মুহূর্তেই বোঝাতে পারতেন। এক কথায়, অসাধারণ ছিল তার বাগ্মীতা।

তার আয়ুষ্কালেও ছিল আশ্চর্য বরকত। মাত্র তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনে তিনি কী না করেছেন! ইসলামকে বৃহৎ পরিসরে গোটা বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। একটি জাতি কয়েক যুগের অব্যাহত সাধনায় যা করতে না পারে, তিনি তা মাত্র তেইশ বছরে করে দেখিয়েছেন। আরবের সীমানা থেকে অবিশ্বাসের আঁধারকে দূরীভূত করেছেন। আঁধারের বুকে আলো প্রতিস্থাপন করেছেন। ন্যায় ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। সত্যকে অবলম্বন করে এমন একটি জাতি গড়ে তুলেছেন—যা মানবসভ্যতার ইতিহাসে অদ্বিতীয়। সর্বোপরি ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি এমন সব নজির রেখে গেছেন যা পরবর্তীদের নিকট সুন্নাহ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং আজও বিনম্র শ্রদ্ধায় পালিত হয়ে আসছে।

তার জীবন থেকে নেওয়া একটি বরকতময় দিনের কথাই ধরা যাক। সেদিন ছিল নহরের দিবস; হজের দশম দিন। সেদিন তিনি ফজর পড়েন মুযদালিফায়, তারপর মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। এই পুরোটা সময়জুড়ে তিনি তাসবীহ[১], তাহলীল[২] ও দুআ-মানুজাতে ব্যাপৃত থাকেন। হজের করণীয় বিষয়ে সবাইকে নির্দেশনা দেন। হাজীদের প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধান দেন। এরপর জামারাতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করেন। মাথা মুণ্ডন ও পশু কুরবানী সম্পন্ন করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন। এরপর যোহরের সালাত আদায় করেন। এসব করতে তার একদিনও লাগেনি; বরং ফজর থেকে যোহরের মধ্যেই সব কিছু সম্পন্ন হয়ে গেছে। এটা অবশ্যই অসামান্য বরকতের বহিঃপ্রকাশ।

কেননা, সেই সময়ে না ছিল কোনো গাড়ি, না কোনো দ্রুতযান। উটের পিঠে চড়ে দূরবর্তী ও জনবহুল সব স্থানে তিনি হাজার হাজার মানুষকে সাথে নিয়ে যাত্রা করেছেন। প্রচণ্ড রোদ, মানুষের অবিরাম প্রশ্ন ও সেগুলোর উত্তর তার যাত্রার গতিকে মন্থর করা সত্ত্বেও কত সুন্দরভাবে সকল কাজ সম্পাদন করেছেন। তাই সকল প্রশংসা আল্লাহর—যিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এত ক্ষুদ্র সময়ে এত বরকতপূর্ণ একটি জীবন দিয়েছেন—যা একের পর এক সাফল্য দিয়ে সুসজ্জিত।

---

[১] সুবহানাল্লাহ বলা।
[২] লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা।

আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তারের অসামান্য ক্ষমতা রাখতেন। অনেক জটিল, সূক্ষ্ম ও অস্বাভাবিক বিষয়ও অনায়াসে বুঝে ফেলতেন এবং সহজ সমাধান দিতেন। একবার তিনি কোনো এক কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কবরে দুইজন ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হচ্ছিল। একজনের আযাবের কারণ ছিল মূত্রত্যাগ করে পানি ব্যবহার না করা আর অপরজন ছিল চোগলখোর। তাদের আযাবের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাছের সবুজ ডাল ভেঙে দুই টুকরো করে তাদের কবরের ওপর রেখে বলেন—

“

لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

এই দুইটি (ডাল) শুকিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি আশা করি তাদের শাস্তি কম হতে থাকবে।[১]

উল্লেখ্য যে, এ ধরনের ব্যাপার একমাত্র নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথেই যায়। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ তার সকল কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণে প্রত্যক্ষ বরকত দান করেছেন।

খায়বারের যুদ্ধে আলী ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু চক্ষুপীড়ায় আক্রান্ত হন। একসময় তিনি দেখার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেন। অবস্থা জানতে পেরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখের লালা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর চোখে লাগিয়ে দেন। আল্লাহর রহমতে মুহূর্তের মধ্যেই তিনি দৃষ্টি ফিরে পান।

খন্দকের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এক হাজার সৈন্য ছিল। যুদ্ধের ভয়াবহতা ও দীর্ঘতার ফলে আটকে পড়া মদীনাবাসীর সকল রসদ ও প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য শেষ হয়ে আসে। ফলে সৈন্যরা তাদের মৌলিক চাহিদা পূরণেও ব্যর্থ হয়ে পড়ে। সেই দুঃসময়ে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু তার ঘরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আরও তিনজন ব্যক্তিকে দাওয়াত দেন। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী যেটুকু খাবার প্রস্তুত করেছিলেন তা চার-পাঁচজনের জন্যও যথেষ্ট ছিল না; কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্যশিবিরের সবাইকে নিয়ে এই দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেন।

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ২১৬, ২১৮; ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহর রাসূলের এই অস্বাভাবিক আচরণে জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রচণ্ড বিস্মিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ, এতটুকু খাবার কোনোভাবেই এই বিশাল সেনাবাহিনীর জন্য যথেষ্ট হতে পারে না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাবারে ফুঁ দিয়ে সৈন্যদের দশজন করে ভেতরে আসতে বলেন। আল্লাহ খাবারে ভরপুর বরকত ঢেলে দেন। ফলে খাবারের পরিমাণ এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, সবাই চাহিদামতো আহার্য গ্রহণ করার পরেও পর্যাপ্ত খাবার অবশিষ্ট রয়ে যায়। শুধু তাই নয়; এই খাবার মদীনার ঘরে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সুবহানাল্লাহ! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! কী অলৌকিক ব্যাপার! এসব তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর আল্লাহর বরকত ছাড়া আর কিছু নয়। এসব তো তার নবুওয়াতের প্রমাণ ছাড়া আর কিছুই নয়!

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চৌদ্দশ সেনা নিয়ে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বিদেশযাত্রা করেন। পথিমধ্যে জনমানবহীন একস্থানে এসে তাদের পানি সঙ্কট দেখা দেয়। মরু-মরিচীকায় যখন মৃত্যুর বিভীষিকা জ্বলজ্বল করে ওঠে তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পানির পাত্র তলব করেন। পাত্রটিতে তখন সামান্য পানি অবশিষ্ট ছিল। তিনি সেই পানি তার পবিত্র হাতে ঢালেন অমনি সবাইকে অবাক করে দিয়ে তার হাত থেকে পানির ফোয়ারা ছুটতে শুরু করে। সেই বরকতের পানি দিয়ে সবাই তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করে। পশুদেরও পান করায়। অজু-গোসলের কাজে ব্যবহার করে। এরপরও পানি অবশিষ্ট থেকে যায়।

أَفَسِحْرٌ هَٰذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ

এটা কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছ না?[১]

আরেক দিনের ঘটনা। সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। জ্বরে তার দেহ পুড়ে যাচ্ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখতে আসেন। এসেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোগীর বুকের ওপর তার হাত মোবারক রাখেন। মুহূর্তেই শরীরের তাপমাত্রা কমে আসে। আল্লাহর অশেষ রহমতে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। অনেক বছর পর তিনি সেই দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আজও আমি আমার বুকের

[১] সূরা তূর, আয়াত : ১৫

ওপর তার হাতের শীতলতা অনুভব করি।'

আরেকবার যখন জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওযূ করে সেই পানি রোগীর ওপর ছিটিয়ে দেন। আল্লাহর রহমতে তিনিও সাথে সাথে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সর্বসত্তা যেমন বরকতময় ছিল তেমনই তার প্রতিটি অঙ্গা-প্রত্যঙ্গাও বরকতপূর্ণ ছিল। এজন্যই তিনি বিভিন্ন সময়ে তার মুণ্ডিত চুল ও ঝরে পড়া দাড়ি দিয়ে বিভিন্ন জনকে পুরস্কৃত করতেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের চুল দিয়ে পুরস্কৃত করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবু তালহা আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু। আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ায় তিনি যুদ্ধের ময়দানে সেনাদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঘোষণা দিতেন। তাদের নানাভাবে যুদ্ধের জন্য উজ্জীবিত করতেন। এজন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নহরের দিন মাথা মুণ্ডন করে ডান পাশের চুল দিয়ে তাকে পুরস্কৃত করেন। কারণ, তার মাথার চুলও ছিল আল্লাহর বরকতপুষ্ট। তাই তিনি চেয়েছিলেন আবু তালহা রাযিয়াল্লাহু আনহু-ও যেন এই বরকতের ভাগীদার হতে পারেন। আর বাম পাশের চুলগুলো তিনি অন্যান্য হাজীদের মাঝে বণ্টন করে দেন। যখন তার কেশরাজি বণ্টন করা হচ্ছিল, তখন উপস্থিত হাজিদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। কেউ এক গোছা; আবার কেউ একটিমাত্র চুল পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতে শুরু করে। কেউ কেউ বরকতের আশায় সেই চুল ভেজানো পানি পান করে। এতটাই বরকতপূর্ণ ছিল নবীজির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সব কিছু!

আবু মাহযুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন ছোট্ট শিশু তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাথায় হাত রেখে আদর করে দিয়েছিলেন। এ কারণে আবু মাহযুরা শপথ করেছিলেন যে, তার যে-চুল আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছে, সে-চুলে তিনি কখনোই ক্ষুর বা কাঁচি ব্যবহার করবেন না।

উল্লেখ্য যে, আবু মাহযুরা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার শপথ পূর্ণ করেছিলেন। আমৃত্যু তিনি মাথায় ক্ষুর বা কাঁচি ব্যবহার করেননি। মৃত্যুর সময় তার চুল অস্বাভাবিক বড় হয়ে যায় এবং সেই চুলসহই তাকে দাফন করা হয়।

ছোট শিশুরা দুধ ও পানিভর্তি পাত্র নিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে যেত। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বরকতময় হাত পাত্রে প্রবেশ করাতেন। দুধ ও পানি তখন বরকতে ভরে যেত। শিশুরা এই দুধ ও পানি পান করে আরোগ্য লাভ করত।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এধরনের অলৌকিক বরকতের ঘটনা অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সেসকল হাদীস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যেখানে অবস্থান করতেন অথবা যেখানে গমন করতেন সেখানেই কল্যাণ ও বরকতের বারিধারা বর্ষিত হতো।

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার এবং সাহাবীদের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন।

দায়িত্ববান অভিভাবক

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

তিনি তাদের নিকট পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ। তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেন।[1]

সুতরাং, শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলদের অবশ্য কর্তব্য হলো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। কারণ, তিনি ছাত্র ও অধীনদের পরম মমতায় বরণ করতেন। পিতৃস্নেহে বুকে আগলে রাখতেন। মায়ার পরশে তাদের ভেতরের সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত করতেন। এক্ষেত্রে কেউ-ই তার সমকক্ষ ছিল না। কাউকে কিছু শেখানোর বেলায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল। অন্যদেরকেও যত্নশীল হওয়ার উপদেশ দিতেন। একটি হাদীসে বলা হয়েছে—

"

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفقَ، وَيُعْطِي على الرِّفق ما لا يُعطي عَلَى العُنفِ، وَما لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুকোমল। কোমলতা পছন্দ করেন এবং কোমলতার বিনিময়ে তিনি এমন কিছু দান করেন, যা রূঢ়তার বিপরীতে দান করেন না।[2]

---

[১] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৬৪

[২] *সহীহ বুখারী* : ৬৯২৭, *সহীহ মুসলিম* : ২৫৯৩, হাদীসটি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে—

إِنَّ الرِّفْقَ لا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

কোমলতা ব্যক্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আর কোমলতা হ্রাস পেলে সৌন্দর্য লোপ পায়।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্দর গুণাবলির জন্য অন্যরা তার প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হতেন। সবাই সারাক্ষণ তার সাহচার্য কামনা করতেন। এদিকে লক্ষ করে মহান আল্লাহ বলেন—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রুক্ষ ও কঠিন হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে দূরে সরে যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন। তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করুন। আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালোবাসেন।[২]

শিক্ষাদানে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ধৈর্য ও দূরদৃষ্টির উদাহরণ হিসেবে নিম্নোক্ত ঘটনাটিই যথেষ্ট। একদিন জনৈক বেদুঈন মসজিদে এসে সালাত পড়তে শুরু করেন। তাশাহুদের সময় বলে ওঠেন—

ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا

হে আল্লাহ, আপনি শুধু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আমার ওপর অনুগ্রহ করুন। আমাদের বাইরে আর কারও ওপর অনুগ্রহ করবেন না।[৩]

---

[১] সহীহ মুসলিম : ২৫৬৪; হাদীসটি উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৫৯

[৩] সহীহ বুখারী : ৬০১০

তার এই প্রার্থনা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাছে ডেকে পরম মমতার সঙ্গে বলেন, এভাবে আল্লাহর বিশাল অনুগ্রহকে মাত্র দুইজন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। কেননা, আল্লাহর অনুগ্রহ এতটাই বিশাল যে, সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত কিছু তার অনুগ্রহের চাদরে জড়ানো। তাই এই প্রার্থনার মাধ্যমে, 'তুমি অবশ্যই বিশাল একটি জিনিসকে ক্ষুদ্র করে ফেলেছ।'

সালাত শেষ করে বেদুঈন লোকটি মসজিদের এক কোণায় গিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে মূত্র ত্যাগ করতে শুরু করেন। উপস্থিত সাহাবীগণ তাকে তিরস্কার করেন এবং প্রহার করতে উদ্যত হন। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিবৃত্ত করে বলেন, 'তাকে বাধা দিয়ো না; বরং স্বাভাবিকভাবে মূত্রত্যাগ শেষ করতে দাও।'

মূত্রত্যাগ শেষ হলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কাছে ডেকে বলেন—

❝

إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ ، لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ ، وَلَا الْقَذَرِ ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالصَّلَاةِ ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

মসজিদে কোনোরকম মূত্রত্যাগ বা ময়লা ফেলার অনুমতি নেই; বরং এটা আল্লাহর স্মরণ, সালাত আদায় এবং কুরআন তিলাওয়াতের স্থান।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে এমন ভদ্রতা ও মহত্ত্বের পরিচয় পেয়ে বেদুঈন স্বজাতির কাছে ফিরে গিয়ে তাদের ইসলামের পথে আহ্বান করে। আল্লাহর অশেষ দয়া ও কুদরতে তারা সবাই তার ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পদ ও ক্ষমতার অধিকারীদের হৃদ্যতা বা আনুকূল্য লাভের জন্য গরীবদের কখনো কটাক্ষ করেননি; বরং তিনি ধনী-গরীব—এমনকি ছোট বাচ্চাদের সাথেও অত্যন্ত আন্তরিক ও কোমল ব্যবহার করেছেন। একদিন এক বালক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে তার দস্তরখানে খাবার খেতে বসে। ধর্মীয় আদব অনুযায়ী পাত্রের যে-অংশ হাতের সবচেয়ে নাগালে থাকে, সেখান থেকেই খাওয়া উচিত; কিন্তু বালকটি তা না

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ৪৩৪

করে; বরং পাত্রের বিভিন্ন জায়গা থেকে খাবার গ্রহণ করছিল। ব্যাপারটি আদবের পরিপন্থী হলেও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কিছুই বলেননি; বরং পিতৃস্নেহে তার ভুল শুধরে দিয়ে বলেন, 'হে বালক, বিসমিল্লাহ বলে ডান হাত দিয়ে খাওয়া শুরু করবে এবং তোমার সামনের দিক থেকে খাবে।'[১]

একবার একদল ইহুদী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বলে, 'আস-সামু আলাইকুম'। অর্থাৎ, আপনার ওপর মৃত্যু আপতিত হোক। 'আস-সামু' আর আস-সালামু-এর উচ্চারণ কাছাকাছি হলেও অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন—প্রথমটার অর্থ মৃত্যু আর দ্বিতীয়টার অর্থ শান্তি। তারা ভেবেছিল যে, তাদের এই সূক্ষ্ম ছল-চাতুরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারবেন না; কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার বিবি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা দু-জনেই তা স্পষ্ট ধরতে পেরেছিলেন। তাই আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা রেগে গিয়ে বলেন, 'বরং তোমাদের ওপরই মৃত্যু ও আল্লাহর অভিশাপ আপতিত হোক।' আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহার একথা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'শান্ত হও আয়িশা! এসব কী বলছ? নিশ্চয় আল্লাহ অন্যায় কাজ ও অশালীন কথা পছন্দ করেন না।' আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো শুনেছেনই তারা কী বলেছে।' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দেন, 'তুমি কি লক্ষ করোনি যে, আমি শুধু ওয়া আলাইকুম বলেছি। এতে তাদের বদদোয়া তাদেরই ওপর আপতিত হবে।[২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শেষোক্ত কথার অর্থ হচ্ছে, তারা 'আস-সামু' বা 'সালামু' যা-ই বলুক না কেন তিনি উত্তরে শুধু বলবেন—'ওয়ালাইকুম'। তখন অর্থ দাঁড়াবে, 'বরং তোমাদের ওপরেও তা আপতিত হোক।' এতে তাদের বদদোয়া থেকে যেমন বাঁচা যাবে; তেমনই মন্দ ভাষা ব্যবহার পরিহার করাও সম্ভব হবে।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিক্ষাদানে আন্তরিকতা রক্ষার পাশাপাশি শিক্ষার পরিমাণ ও সময়-সচেতনতার প্রতিও যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। এজন্যই তিনি

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৫৩৭৬, ৫৩৭৮; *সহীহ মুসলিম* : ২০২২; হাদীসটি উমার ইবনু আবি সালামাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] *সহীহ বুখারী* : ২৯৩৫, ৬০৩০; *সহীহ মুসলিম* : ২১৬৫, হাদীসটি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

সাহাবীদের কোনো দিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো তথ্য জানাননি। তার বয়ান ও উপদেশ শোনার জন্য সাহাবীদের কোনো দিন একটিবারের জন্যও বাধ্য করেননি। অথচ বাধ্য করা হলেই বরং তারা বেশি খুশি হতেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেয়াল রাখতেন তারা যেন প্রতিদিন লম্বা বয়ানে বিরক্ত না হয়ে পড়ে। তাই এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে যেতে তিনি যথেষ্ট সময় নিতেন। এতে তাদের শোনার আগ্রহ বজায় থাকত; বরং আরও বৃদ্ধি পেত। ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়ান শোনার জন্য তারা অধীর হয়ে থাকতেন। তাছাড়া এ বিরতি পরবর্তী বয়ানের আগ পর্যন্ত তাদের আত্মার খোরাক হিসেবে কাজে দিত।

অধিকন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়ানগুলো হতো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থপূর্ণ ও সারগর্ভ। তিনি এই গুণ শুধু নিজে ধারণ করেই ক্ষান্ত হননি; বরং অন্যদেরকেও আদর্শ হিসেবে মান্য করার পরামর্শ দিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

“

إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ

বক্তব্যের সংক্ষিপ্ততা এবং সালাতের দীর্ঘতা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৈধ বিনোদনও সমর্থন করতেন। অনেক সময় উৎসাহও দিতেন। একবার আবিসিনিয়ার লোকেরা মসজিদে বর্শা নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বিনোদনে মেতে ওঠে। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ব্যাপারটি অনভিপ্রেত মনে হলে তিনি তাদের বাধা দেন। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

دَعْهُم يا عُمرُ ! لِتَعْلَمَ يَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا فُسْحَةً

হে উমার, তাদের সুযোগ দাও—যাতে ইহুদীরা জানতে পারে যে, আমাদের দ্বীনে প্রশস্ততা রয়েছে।[২]

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ৮৬৯; হাদীসটি আম্মার রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] *মুসনাদে আহমাদ* : ২৪৩৩৪, ২৫৪৩১; হাদীসটি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; *কাশফ আল খফা* : ৬৫৮

আরেকবার ঈদের সময় আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবীজির সঙ্গে দেখা করতে যান। তিনি তখন আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-এর কামরায় ছিলেন। আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু ভেতরে এসে দেখেন, দুইজন মেয়ে গান গাইছে। তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলে ওঠেন, 'নবীজির উপস্থিতিতে শয়তানের গান গাওয়া হচ্ছে!' এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا

ওদের সুযোগ দাও, আবু বকর; অবশ্যই সকল সম্প্রদায়েরই নিজস্ব উৎসবের দিন রয়েছে। আর আজ আমাদের উৎসবের দিন।[১]

একবার আনসারদের একটি বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করেন—'সেখানে কি তোমাদের বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল? আনসারীরা তো বিনোদন পছন্দ করে।'[২]

স্মরণযোগ্য যে, এখানে যে-বিনোদনের কথা বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ হালাল বিনোদন। এ-বিনোদন মনকে সতেজ করে এবং প্রাত্যহিক কাজের একঘেয়েমি দূর করে। আর যে-বিনোদন হারাম, সে-ব্যাপারে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে আর কে বেশি সতর্ক হতে পারে!

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের কার্যকর শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেশ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। যেমন—নির্দেশিত বিষয়টি তিনবার করে বলতেন। এমন সহজ ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলার চেষ্টা করতেন, যা সর্বস্তরের মানুষ সহজেই বুঝতে ও মনে রাখতে পারে। তার বলার ভঙ্গি থেকেই বিষয়ের গুরুত্ব বোঝা যেত।

তবে তার সবচেয়ে সেরা শিক্ষাদান-পদ্ধতি এই ছিল যে, তিনি নিজেই সব কিছুর আদর্শ হয়ে যেতেন। তিনি মানুষকে আল্লাহর ভয় শিক্ষা দিতেন। তার এই শিক্ষাদান কেবল মৌখিক বক্তব্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তিনি যা বলতেন, তা সবার আগে নিজের মধ্যে ধারণ করতেন। আর আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে তার থেকে অগ্রবর্তী

[১] সহীহ বুখারী : ৯৫২, ৩৯৩১; সহীহ মুসলিম : ৮৯২; হাদীসটি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] সহীহ বুখারী : ৫১৬৩; হাদীসটি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আর কে হতে পারে! যখন তিনি কোনোকিছু থেকে অন্যকে বিরত থাকতে বলতেন, তখন সবার আগে ওই বিষয়ে তিনিই সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতেন। যখন তিনি সাহাবীদের আল্লাহর কথা বলতেন অথবা মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের কথা স্মরণ করতে বলতেন, তখন তার গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। তিনি সবাইকে উন্নত আচার-আচরণ আয়ত্ত করার উপদেশ দিতেন; নিজেও সবার সাথে সর্বোত্তম আচরণ করতেন।

মানুষকে তিনি আল্লাহর স্মরণের প্রতি আহ্বান করতেন। মুক্ত হস্তে দান করতে উদ্বুদ্ধ করতেন, পরিবার, প্রতিবেশী এবং অন্য সবার প্রতি সদাচারের আদেশ করতেন। নিজেও এসব ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা সজাগ ও সবচেয়ে বেশি যত্নশীল থাকতেন। মোটকথা, যে-ধর্মীয় শিক্ষাই তিনি অন্যদের অনুসরণ করতে বলতেন, তা তিনি নিজেও অনুসরণ করতেন।

এ কারণে সাহাবীদের দেওয়া তার শিক্ষার সুফল ছিল সুদূরপ্রসারী। তাই তো যতদিন তারা বেঁচে ছিলেন, ততদিন তার আদেশ-উপদেশ পালন করে গেছেন। শুধু নিজেরাই চর্চা করে থেমে থাকেননি; বরং পরবর্তী প্রজন্মকেও তা শিক্ষা দিয়ে গেছেন। যে তাকে একবার দেখেছে, বিশ্বাস করেছে এবং মুহূর্তকাল হলেও তার সাথে কাটিয়েছে, সে সারাটা জীবন তাকে মনে রেখেছে। এমনকি ওই ব্যক্তির জীবনে যদি স্মরণীয় দিন বলে কিছু থেকে থাকে তবে নিঃসন্দেহে তা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাতের দিনটি। শিক্ষক হিসেবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রভাব এতটাই গভীর ছিল!

অবশ্য এসব সম্ভব হয়েছিল কেবল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি আল্লাহর সীমাহীন দয়া এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সত্যবাদিতা, দায়িত্বশীলতা ও সুন্দর চরিত্রের কারণে।

দরূদের আবশ্যকতা

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর জন্য রহমতের দুআ করো এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ করো।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দরূদ পাঠ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। দরূদ পাঠ করলে অন্তরে অসম্ভব রকমের শান্তি অনুভূত হয়। দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূরীভূত হয়। আনন্দে হৃদয়ের অলিন্দ কানায় কানায় ভরে যায়। যখন কেউ কোনো মজলিসে আল্লাহর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর দরূদ পাঠ করে, তখন সেই মজলিসে আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হয়। অপার্থিব শান্তি ও নিশ্চিন্ততায় সবার মন ছেয়ে যায়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা তার প্রতি ভালোবাসারই বহিঃপ্রকাশ। এটা একই সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি আনুগত্য এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাসের সাক্ষ্য দেয়। কারণ, যে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে ভালোবাসে সে তার নবীকে ভালো না বেসে থাকতে পারে না।

[১] সূরা : আহযাব, আয়াত : ৫৬

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ كَتَبَ اللَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ ، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيِّئَاتٍ ، وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ ، وَكُنَّ بِهِ عَدْلَ عِتْقِ عَشْرِ رِقَابٍ

যে-ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার ওপর দশবার রহমত বর্ষণ করবেন। তার সম্মান দশগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। সেই সঙ্গে তার আমলনামায় দশটি ভালো কাজের সাওয়াব লিখে দেওয়া হবে এবং দশটি খারাপ কাজের হিসেব মুছে ফেলা হবে।[১]

অপর এক হাদীসে এসেছে—

“

أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ

জুমুআর আগের রাতে এবং জুমুআর দিনে আমার প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করবে।[২]

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে—

“

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

ধিক ওই ব্যক্তির প্রতি, যার উপস্থিতিতে আমার নাম উচ্চারিত হয়, অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না।[৩]

আরও বর্ণিত হয়েছে—

---

[১] *সুনানু নাসায়ী, আল কুবরা* : ৯৮৯০; *আমালাল ইয়াওম ওয়াল লায়লা* : ৬৩; হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] *মুসনাদে আহমাদ* : ৩৬৫৭, ৪১৯৮; *সুনানু নাসায়ী* : ১২৮২, *সুনানু দারিমী* : ২৭৭৪; *আল হাকিম* : ৩৫৭৬; হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[৩] *ইবনে আদী, আল কামিল* : ৩/১০২; *বায়হাকী, আল সুনানুল কুবরা* : ৫৭৯০; *আশ-শুয়াব আল ঈমাম* : ৩০৩০; হাদীসটি আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; *কাশফ আল খফা* : ১/১৯০

“

الْبَخِيلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

কৃপণ তো সেই ব্যক্তি, যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হয়, কিন্তু সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে না।[১]

তিনি আরও বলেন—

“

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ

অবশ্যই আল্লাহর অধীনে এমন ফেরেশতা নিযুক্ত আছে—যারা সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায় এবং আমার উম্মতের কাছ থেকে আমার জন্য সালাম নিয়ে আসে।[২]

অধিকন্তু যখন উবাই ইবনে কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, ‘আমি আমার সমস্ত দুআ আপনার জন্য করব।’ তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন—‘তাহলে তোমার গুনাহসমূহকে মাফ করে দেওয়া হবে এবং তোমাকে চিন্তামুক্ত করে দেওয়া হবে।’[৩]

দরূদ শরীফ পাঠ করাটা মোটেও হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয়; বরং মুসলিম হিসেবে দরূদ পাঠ করতে পারাটা অন্যতম সেরা একটি কাজ—যা আমাদের প্রতিদিন করা দরকার। যখনই প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা মনে আসে, তখনই দরূদ পাঠ করে নেওয়া উচিত। জুমুআ ও বিয়ের খুতবাতে, ঈদের খুশিতে, বৃষ্টির প্রার্থনায়, জ্ঞান-চর্চার মজলিসে—সবখানে দরূদ পাঠ খুবই জরুরি। বই-পত্রে, চুক্তিনামায়, একে অন্যের সাথে সাক্ষাতে ও বিদায়ে, সকাল-সন্ধ্যার সালাতে, দুআ-মুনাজাতে, সুখে-দুঃখে, তার জীবন নিয়ে আলোচনা সভায়—মোটকথা, যখনই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা স্মরণ হবে, তার ওপর দরূদ পাঠ করতে হবে।

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ* : ৭৪০২; *জামি তিরমিযী* : ৩৫৪৫; *আল হাকিম* : ২০১৬; হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] *মুসনাদে আহমাদ* : ১৭৩৮, *জামি তিরমিযী* : ৩৫৪৬; হাদীসটি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; *কাশফ আল খফা* : ১/৩৩২

[৩] *জামি তিরমিযী* : ২৪৫৭

হে আল্লাহ, যতদিন দিনের পরে রাত, আর রাতের পরে দিন আসবে, আসমান থেকে বৃষ্টি এসে যমীনকে ভিজিয়ে যাবে, রাতের আকাশে তারা জ্বলতে থাকবে—ততদিন যেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর অবারিত শান্তি বর্ষিত হতে থাকে। হে আল্লাহ, আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার পবিত্র পরিবার, তার অনুগত আনসার-মুহাজিরীন এবং যারা তাকে সততা ও নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করে তাদের সকলের ওপরই আপনি রাজি হয়ে যান এবং শান্তি বর্ষণ করুন।

সম্মান প্রদর্শন

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

মুমিনগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের ওপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উঁচুস্বরে কথা বল, তার সাথে সেরূপ উঁচুস্বরে কথা বলো না। এতে তোমাদের কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে এবং তোমরা টেরও পাবে না।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা ইসলামের মূলনীতিগুলোর অন্তর্গত। যে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে। আর যে বীতশ্রদ্ধ হবে, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাকে সম্মানের উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত রেখে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামের একটি মৌলিক বিষয়। তাই আমাদের সবার উচিত হলো পরিমীতিবোধ বজায় রেখে তাকে ভালোবাসা। এক্ষেত্রে কোনো প্রকার শিথিলতা বা সীমালঙ্ঘন না করা। যেমন, খ্রিস্টানরা তাদের রাসূলকে খোদা বলে দাবি করে। এই অত্যুচ্চ মর্যাদার দাবি করা যেমন সীমালংঘন, তেমনই তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাও চরম শিথিলতা।

[১] সূরা হুজরাত, আয়াত : ২

আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-কাজ করেছেন অথবা যে-কথা সে-কাজ বা কথার বিরোধিতা করা কোনো মুসলিমের পক্ষে শোভা পায় না; বরং তার প্রতিটি আদেশ ও নিষেধ আমাদের খুশিমনে মেন চলা একান্ত অপরিহার্য। উপরন্তু মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ মানুষের চিন্তা ও বক্তব্যে শুদ্ধাশুদ্ধির আশঙ্কা থাকলেও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ব্যাপারে আদৌ এমন কোনো আশঙ্কা নেই। এমন আশঙ্কা মনে স্থান দেওয়াও ঈমানের দুর্বলতার পরিচায়ক।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বলা প্রতিটি কথা সত্য। কারণ, আল্লাহর অশেষ দয়ায় তিনি ভুলের ঊর্ধ্বে ছিলেন। তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি কোনোভাবেই বীতশ্রদ্ধ হওয়া যাবে না এবং তার স্পষ্ট সত্য-ভাষণ নিয়ে কোনোরূপ সন্দেহ করা যাবে না। তার করা কোনো বিচারের রায় নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না। আর কোনোভাবেই কোনো রাজা, নেতা, রাষ্ট্রপতি অথবা শাসকের বলা কথার সাথে তার কথার তুলনা করা চলবে না। কারণ, আল্লাহপাক তাকে এসব-শ্রেণির অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন।

কার্যত আল্লাহর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে হেয় করা হয় এমন কোনো শব্দ উচ্চারণ করা অথবা কাজে লিপ্ত হওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য। কোনো মুসলিম যদি তাকে রাসূল হিসেবে পেয়ে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকে, তার প্রতি গভীর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নিজেকে তার অনুসারী বলে দাবি করে তাহলে তার উচিত হবে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অন্য যে-কোনো মানুষের চেয়ে ওপরে স্থান দেওয়া ও সম্মান করা। তার প্রতি মা-বাবা, স্ত্রী-সন্তান এবং অন্য সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসা থাকতে হবে। এমনকি নিজের চেয়েও তাকে বেশি ভালোবাসতে হবে। তার বলা প্রতিটি কথাকে বিশ্বাস করে তার আদেশ মেনে চলতে হবে এবং নিষেধসমূহ থেকে দূরে থাকতে হবে। তার সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে। তার আনীত বিধি-বিধানে সন্তুষ্ট থাকতে হবে এবং সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে তার আদর্শ আঁকড়ে ধরতে হবে।

তাই তার নাম বা তার হাদীস নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা যাবে না, বিরূপ আচরণ বা মন্তব্য করা যাবে না। তার সমস্ত অলৌকিক ঘটনার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে তার ও তার পরিবার এবং সাহাবীদের সম্মান রক্ষার চেষ্টা করে যেতে হবে। কারণ, বর্ণিত হয়েছে—

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

সুতরাং, যে-সব লোক তার ওপর ঈমান এনেছে, তার সাহচর্য অবলম্বন করেছে, তাকে সাহায্য করেছে এবং সে-নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে, শুধু তারাই নিজেদের উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করতে পেরেছে।[১]

মহান আল্লাহর এই ঘোষণার কারণে সাহাবীগণ যেভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আগলে রেখেছেন, তার প্রতি যে-মনোভাব পোষণ করেছেন, আমাদেরও ঠিক তা-ই করতে হবে। তারা অত্যন্ত নিচুস্বরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে কথা বলতেন। আর যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে কথা বলতেন তখন তারা এতটাই মনোযোগী হয়ে উঠতেন, দেখলে মনে হতো—তাদের মাথায় কোনো পাখি বসে আছে। নড়াচড়া করলে যদি পাখি উড়ে যায়, এই আশঙ্কায় যেন তারা ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন।

কখনো যদি এমন হতো যে, কোনো ব্যক্তি মসজিদে যাচ্ছে এবং ভেতরে প্রবেশ করার আগেই ভেতর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কণ্ঠে শোনা যায়, 'হে লোকসকল, তোমরা বসে পড়ো' তাহলে তার এই ঘোষণা শোনামাত্রই শ্রবণকারী সেখানেই বসে পড়ত। সাহাবীগণ তাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এতটাই সম্মান করতেন। তাদের আপন সন্তানও যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা মানতে অস্বীকৃতি জানাত তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ সন্তানের সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানাতেন। এগুলো সাহাবীদের নবীপ্রেমের অসংখ্য ঘটনার মাঝে সামান্য কিছু ঘটনামাত্র।

[১] সূরা আরাফ, আয়াত : ৫৭

মহান সুসংবাদদাতা

❝

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا

আপনি মুমিনদের সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

❝

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلاَ تُنَفِّرُوا

মানুষকে সুসংবাদ দাও। বীতস্পৃহ করো না। বিষয়বস্তু সহজ করো। কঠিন করো না।[২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরিত্রের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—মানুষকে সুসংবাদ প্রদান করা। কুরআনে কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে—

---

[১] সূরা আহযাব, আয়াত: ৪৭

[২] *সহীহ বুখারী* : ৬৯, ৬১২৫; *সহীহ মুসলিম* : ১৭৩৪, হাদীসটি আনাস ইবনে মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

হে নবী, আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জন্য অসংখ্য সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন। মানবজাতির জন্য বয়ে এনেছেন অজস্র আনন্দবার্তা। আর এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সুসংবাদ ছিল মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানের আহ্বান। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারার চেয়ে বড় আনন্দ আর কী হতে পারে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের আগে মানুষ অন্ধকার ও কুফরের যুগে বাস করত। তাদের সকল চিন্তা কেবল এই দুনিয়া ও পার্থিব-জীবন কেন্দ্রিক ছিল। উদ্দেশ্যহীনভাবে তারা মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছিল—এই বিশ্বাসে যে, মৃত্যুই শেষ। মৃত্যুর পর শুধুই শূন্যতা। জান্নাত বা জাহান্নাম বলতে কিছু নেই।

তাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পরকালের সুসংবাদ নিয়ে হাজির হন তখন তারা তাদের রবের কৃপায় জান্নাতের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে। তাদের এই স্বপ্ন ছিল আসমান ও যমীনের চেয়েও অধিক প্রশস্ত। তাদের রবের ব্যাপারে সুসংবাদ তো তিনিই এনে দিয়েছেন। আল্লাহর ক্ষমাশীলতা, দয়াপরবশতা এবং উদারতা সম্পর্কে তিনিই তো জানিয়েছেন। মানুষ যত গুনাহই করুক না কেন, আল্লাহর কাছে তওবা করা মাত্রই আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন—এই সংবাদও তো তিনিই আমাদের দিয়েছেন!

প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিশাল একটি অংশজুড়ে রয়েছে মানবসম্প্রদায়ের সুসংবাদের অজস্র বর্ণনা। যে ওযূ করে, তার জন্য রয়েছে প্রত্যেকবার ওযূর সাথে গুনাহ মাফের সুসংবাদ। এক ওয়াক্তের সালাত থেকে আরেক ওয়াক্ত, এক রামাদান থেকে আরেক রামাদান, একটি হজ থেকে আরেকটি হজ এবং এক উমরাহ থেকে আরেক উমরাহ পর্যন্ত একজন মুসলিমের জন্য রয়েছে তার সকল গুনাহ মাফের সুসংবাদ। অবশ্য সেসব কবীরা গুনাহ এর আওতামুক্ত, যেগুলো তওবা ছাড়া মাফ হয় না। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই সকল সুসংবাদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই আমাদের দিয়েছেন।

---

[১] সূরা আহযাব, আয়াত : ৪৫

অন্ধের জন্য তিনি এই সুসংবাদ বয়ে এনেছেন যে, তার এ অবস্থায় ধৈর্যধারণের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাকে জান্নাত দেবেন। সন্তানহারা মা-বাবাকে ধৈর্যধারণের শর্তে জান্নাতে সুবিশাল প্রাসাদের মালিক হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। যারা দীর্ঘদিন ধরে রোগে-শোকে জর্জরিত, তাদের গুনাহ মাফের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যারা দুঃখ-দুর্দশায় আক্রান্ত, তাদের মহাকল্যাণের খোশখবর দিয়েছেন। কারণ, আল্লাহ যে-বান্দার ভালো চান, তাকেই দুঃখ-কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন।

উপরন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যারা এক ওয়াক্তের সালাত শেষ করে পরবর্তী ওয়াক্তের সালাতের জন্য অপেক্ষা করে তাদের জন্য রয়েছে ফেরেশতাদের দুআ—যতক্ষণ তারা নিজেদের পবিত্রতা ধরে রাখে। ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছের সুসংবাদ রয়েছে, যে সারা জীবনে মাত্র একবার 'সুবহানাল্লাহ্' বলেছে। তিনি আরও বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি দিনে একশতবার 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' পড়ে, তবে তার গুনাহ যদি সাগরের ফেনার সমপরিমাণও হয় তাহলেও আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন। যে-ব্যক্তি গুনাহ করার পর ওযূ করে দুই রাকআত সালাত আদায় করে তার জন্যও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর ক্ষমার সুসংবাদ এনেছেন। যদি কেউ অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-দুর্দশা, দুশ্চিন্তা, এমনকি একটি কাঁটার আঘাতও পায়, তাহলে এর বিনিময়েও তার গুনাহ মাফ হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন।

সর্বোপরি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি মহাগ্রন্থ নিয়ে আগমন করেছেন, যাতে সৎকর্মশীল মুমিনদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কারের সুসংবাদ; আর অসৎকর্মপরায়ণ মুমিনদের প্রতি হতাশ হওয়ার নিষেধাজ্ঞা। ইরশাদ হচ্ছে—

إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবিশ্বাসী লোকেরাই কেবল আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়।[১]

অন্যত্র ঘোষণা করা হয়েছে —

[১] সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৭

قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ

তিনি বললেন, পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া আর কে নিরাশ হয়?[১]

মহান আল্লাহ মানুষকে দুঃখীত হতে নিষেধ করে বলেছেন—

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখও কোরো না। তোমরাই বিজয়ী হবে। যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।[২]

সর্বোপরি গুনাহগারদের জন্য এর চেয়ে বড় সুসংবাদ আর কী হতে পারে—

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

বলুন, নিজেদের ওপর যুলুমকারী হে আমার বান্দাগণ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৩]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে ইসলামের পথে আনার জন্য দূর-দূরান্তে দূত প্রেরণ করতেন। তিনি তাদের বলে দিতেন—

بَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا ، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

তোমরা মানুষকে সুসংবাদ দাও। বীতস্পৃহ করো না। তাদের জন্য বিষয়বস্তু সহজ করো। কঠিন করো না।[৪]

[১] সূরা হিজর, আয়াত : ৫৬

[২] সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৩৯

[৩] সূরা যুমার, আয়াত : ৫৩

[৪] প্রাগুক্ত

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের প্রতি রুক্ষ আচরণ করতে বারণ করেছেন। কারণ, রুক্ষতা মানুষের মনে ধর্মের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে। তাই তিনি বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ

হে লোকসকল, নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা অন্যদের ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। যখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ ইমামতি করবে তখন সে যেন সালাত সংক্ষিপ্ত করে। কারণ, মুসল্লিদের মধ্যে দুর্বল, বয়স্ক, ও প্রয়োজন-তাড়িত ব্যক্তিও থাকে।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই অন্যদের ভালো সংবাদ দিতেন। তিনি আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে আল্লাহর তরফ থেকে পবিত্রতার ঘোষণা শোনান; কাব ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ জানান; জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু-কে জানান যে, আল্লাহ তার পিতার সাথে কথা বলেছেন। একবার সাহাবীদের তিনি জায়দ রাযিয়াল্লাহু আনহু, জাফর রাযিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে রাওয়াহাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর ব্যাপারে জান্নাতবাসী হবার খবর দেন। বদরের যোদ্ধাদের জন্যও তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে—

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

তোমরা যা ইচ্ছে করতে পারো। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।[২]

এছাড়াও যারা হুদায়বিয়া প্রান্তরে বিখ্যাত বাবলা গাছের নিচে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন, তাদের আল্লাহর সন্তুষ্টির খোশখবর দেন। ইসলামী দণ্ডবিধি অনুযায়ী সাজাপ্রাপ্ত জনৈক ব্যক্তি যখন তার সাথে সালাত আদায় করেছিল তখন আল্লাহর রাসূল তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তির সুসংবাদ প্রদান করেন। যে-ব্যক্তি সদা-সর্বক্ষণ সূরা ইখলাস পাঠ করত, তিনি তাকে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৯০, ৭০২; *সহীহ মুসলিম* : ৪৬৬, হাদীসটি আবু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] *সহীহ বুখারী* : ৩০০৭, ৩৯৮৩; *সহীহ মুসলিম* : ২৪৯৪, হাদীসটি আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

সুসংবাদ দেন। মোটকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবাইকে কেবল সুসংবাদ আর সুসংবাদই দিয়ে গিয়েছেন। এ কারণে আনন্দ প্রকাশের জন্য তাদের বিশেষ কোনো উপলক্ষের প্রয়োজন পড়ত না।

আদর্শ শিক্ষক

মহান আল্লাহ বলেন—

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

আল্লাহ আপনার প্রতি ঐশীগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না। আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা অসীম।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

"

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

যে-ব্যক্তি দ্বীনি ইলম অর্জনের জন্য যাত্রা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেবেন।[২]

দ্বীনি ইলমের ক্ষেত্রে মুসলিমদের শিক্ষক হিসেবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই যথেষ্ট। তিনি ঈমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে শুরু করে ইবাদাতের মৌলিক

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১১৩

[২] *সহীহ মুসলিম* : ২৬৯৯; হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

পদ্ধতি, পানাহারের আদব; এমনকি পেশাপ-পায়খানার নিয়ম-নীতি পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাধারণ বিষয়ে বয়ান করতেন তখন ভয়ে ও আবেগে শ্রোতাদের হৃদয় বিগলিত হতো। আর যখন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে বয়ান করতেন তখন স্বর ক্রমশ উঁচু হতে থাকত, চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করত, চেহারায় প্রচণ্ড ক্রোধের লক্ষণ ফুটে উঠত। মনে হতো, যেন আসন্ন কোনো শত্রুদলের ব্যাপারে তিনি সবাইকে সাবধান করছেন। তার কণ্ঠের গভীরতা এবং পরকালের ভয়াবহতার কথা শুনে উপস্থিত অনেকেই কেঁদে ফেলতেন কিংবা অন্তত তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে অনুতপ্ত হতেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুখ নিঃসৃত কথাগুলো ছিল প্রজ্ঞাপূর্ণ—যা সব সময় সঠিক পথের নির্দেশনা দিত এবং সাহাবীদের ঈমান-বৃদ্ধিতে কাজে আসত। কেউ তার কাছে কোনো ব্যাপারে ফতোয়া জানতে চাইলে তিনি সাথে সাথে সেই ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ করে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করতেন। কেউ তার কাছে কোনো উপদেশ চাইলে তিনি এমন উত্তর দিতেন—যাতে করে প্রশ্নকর্তার মন সততা, বিশ্বাস এবং ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যখন তিনি কোনো উপদেশমূলক গল্প বলতেন, তখন তিনি এমন উদাহরণই পেশ করতেন—যা সাহাবীদের জন্য স্পষ্ট ও বোধগম্য। যখন তিনি পূর্ববর্তী জাতিদের নিয়ে কথা বলতেন, সাহাবীগণ পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তা শুনতেন এবং শিক্ষা গ্রহণ করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়ান যেন তাদের হৃদয় বন্দী করে ফেলত। ফলে তারা সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও সুন্দর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন। তবে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় মাধ্যম ছিল উদ্দিস্ট কাজটি নিজে করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। তার করা সব কিছু ছিল পবিত্র ও মহৎ। আর যা করেননি এবং অন্যকেও করার অনুমতি দেননি, তা ছিল অপবিত্র ও ক্ষতিকর। ইসলামের প্রতিটি অংশই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুসরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই যুগ যুগ ধরে নিষ্ঠাবান মুসলিমগণ তার সুন্নাহ অনুসরণ করে আসছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর নাযিল হওয়া মহাসত্যের প্রথম শব্দই ছিল 'পড়ো'। শিক্ষার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এরচেয়ে বড় এবং শক্তিশালী উদাহরণ আর হতে পারে না। আল্লাহ তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এই দুআ করতে নির্দেশ দিয়েছেন—

رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

উচ্চারণ—'রব্বি যিদনী ইলমা।' অর্থাৎ 'হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দেন।'[১]

আল্লাহপাক চাইলেই অন্য অনেক কিছুই চাওয়ার আদেশ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে; বরং জ্ঞান বৃদ্ধির দুআ করার আদেশ করেছেন। কারণ, একমাত্র জ্ঞানই মানুষকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে। জ্ঞান হলো একটি দরজা—যার অন্যপাশে রয়েছে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সাফল্যের ঐশ্বর্য। ভালো কথা এবং সৎ কাজ করতে বলারও আগে আল্লাহ জ্ঞান অর্জন করতে বলেছেন। কুরআনে কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে—

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ

জেনে রাখুন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই।[২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

إِنَّ مَثَلَ مَا بعَثَنِى اللّٰه بِهِ مِنَ الْهُدَى والْعِلْمِ كَمَثَلَ غَيْثٍ

মহান আল্লাহ আমাকে যে-জ্ঞান ও পথ-নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত হলো বর্ষণমুখর মেঘ।[৩]

বস্তুত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেওয়া আল্লাহর বিশেষ একটি রহমত হলো জ্ঞান। আর সেই জ্ঞান প্রচার করা ছিল তার ওপর বর্তানো সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। কুরআনে কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে—

---

[১] সূরা ত-হা, আয়াত : ১১৪

[২] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ১৯

[৩] *সহীহ বুখারী* : ৭৯; *সহীহ মুসলিম* : ২২৮২, হাদীসটি আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

তিনি তাদের কিতাব ও হিকমাহ শিক্ষা দেবেন।[১]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পালন করেছেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় সেইসব ফকীহ, তাফসীরকারক, ধর্ম প্রচারক, হাদীসবেত্তা ও বিজ্ঞ আলিমের মাধ্যমে, যারা তার জীবদ্দশায় তারই অধীনে থেকে জ্ঞানলাভ করেছেন। এই আলোর মশালবাহীরাই পরবর্তী সময়ে পৃথিবীকে করেছেন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত, ছড়িয়ে দিয়েছেন প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বার্তা এবং তুলে নিয়েছেন তার রেখে যাওয়া দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রচারিত বার্তা সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব সাহাবীদের দিয়ে গেছেন। ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও বিদায় হজের বিখ্যাত ভাষণে তিনি বলেছেন—

❝

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فإنّه رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ لِمَن هو أَوْعَى له

উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে আমার এই পয়গাম পৌঁছে দেয়। কারণ, হতে পারে পরবর্তী কোনো শ্রোতা উপস্থিত ব্যক্তির চেয়েও বেশি যোগ্য।[২]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

❝

نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ

আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে প্রাণবন্ত রাখুন, যে আমার কথা শুনে মুখস্থ করে অতঃপর অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়। কারণ, অনেক শ্রোতা বার্তাবাহক অপেক্ষাও অধিক জ্ঞানী হয়ে থাকে।[৩]

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ১২৯

[২] *সহীহ বুখারী* : ১৭৪১, ৭০৭৮; *সহীহ মুসলিম* : ১৬৭৯, হাদীসটি আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[৩] *জামি তিরমিযী* : ২৬৫৮; ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে; *কাশফ আল খফা*

আরেক হাদীসে আছে—

“

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَو آيَةً

আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও অন্যের কাছে পৌঁছে দাও।[১]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পুরোটা জীবন কেটেছে উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার পেছনে। তিনি শিখিয়েছেন কীভাবে সালাত আদায় করতে হয়, রোযা রাখতে হয়, যাকাত দিতে হয়, হজ করতে হয়। আল্লাহকে স্মরণ করা, তার দরবারে প্রার্থনা করা এবং পানাহার করাসহ যাবতীয় আদব-কায়দা তো তার হাত ধরেই শেখা। আর এই সব কিছু একদিনে হয়ে যায়নি। বছরের পর বছর ধরে অল্প অল্প করে অথচ পর্যায়ক্রমে তিনি সব কিছু শিখিয়ে গেছেন। কুরআনে কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে—

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ

আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি পৃথকভাবে পাঠের উপযোগী করে, যাতে আপনি তা লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করেতে পারেন। আর আমি তা অবতীর্ণ করেছি পর্যায়ক্রমে।[২]

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

সত্য প্রত্যাখানকারীরা বলে, তার প্রতি সমগ্র কুরআন একদফায় কেন অবতীর্ণ করা হলো না? আমি এমনিভাবে একে অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করেছি আপনার অন্তকরণকে মজবুত করার জন্য।[৩]

: ২/৪২৩

[১] *সহীহ বুখারী* : ৩৪৬১; হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

[২] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ১০৬

[৩] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৩২

সাহাবীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি নীতি ও অভ্যাস এই ছিল যে, তিনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আগে শিক্ষা দিতেন। প্রয়োজনভেদে একটি কথা একবার, দুইবার বা তিনবারও বলতেন। তিনি বারবার পুনরাবৃত্তি করতেন— যাতে সাহাবীগণ মূল বিষয়টি খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারেন।

ইবাদাতের নতুন কোনো পন্থা শেখানোর আগে তিনি নিজে তা করে দেখাতেন। এভাবেই সাহাবীগণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখে দেখে নির্ভুলভাবে শেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

“

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

তোমরা সেভাবেই সালাত আদায় করো, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছ।[১]

আরও বলেছেন—

“

خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ

তোমরা আমার কাছ থেকে হজের বিধি-বিধান শিখে নাও।[২]

অন্যভাবে বললে, ‘আমি যা বলি তা শোনো, যা করি তা খেয়াল করো এবং ঠিক তা-ই নিজেরা পালন করো।’

ইয়া আল্লাহ, আমাদের প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর, তার পরিবারবর্গের ওপর, সম্মানিত সাহাবীগণের ওপর এবং যারা তাদের রাসূলকে ভালোবেসে তার দেখানো পথ অনুসরণ করে তাদের সবার ওপর শেষ দিন পর্যন্ত রহমতের বারিধারা বর্ষণ করতে থাকুন।

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ৬৩১; হাদীসটি মালিক ইবনুল হুওয়ায়রিস রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।
[২] *সহীহ মুসলিম* : ১২৯৭; হাদীসটি জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

লেখক-পরিচিতি

আয়িয ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি আল-কারনী। আরববিশ্বের প্রখ্যাত আলিম, বিশ্ববরেণ্য ও পাঠকনন্দিত একজন তারকা লেখক। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে যিনি ড. আয়িয আল-কারনী—নামেই সমধিক পরিচিত। ১৩৭৯ হিজরীতে সৌদি আরবের দক্ষিণ অঞ্চলের মাজদ্ আল-কারনী গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

লেখাপড়া করেছেন রিয়াদের 'ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়'-এ। হিজরী ১৪০৩-১৪০৪ শিক্ষাবর্ষে তিনি এখান থেকেই 'উসুল আদ-দ্বীন'-এর ওপর স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৪০৮ হিজরীতে তিনি 'উচ্চতর হাদীসশাস্ত্র'-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এসময়ে তাঁর রচিত গবেষণামূলক প্রবন্ধের নাম ছিল 'ধর্মে নতুন উদ্ভাবন; হাদীসের বর্ণনা ও শিক্ষায় এর প্রভাব'। এরপর ১৪২২ হিজরীতে তিনি লাভ করেন পিএইচডি ডিগ্রি। তার অভিসন্দর্ভটি ছিল ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ-এর *আল মুফহিম আলা সাহীহিল মুসলিম* গ্রন্থের ওপর একটি বিশ্লেষণাত্মক পাঠের ওপর ভিত্তি করে।

লেখায় ও বলায় ড. আয়িয আল-কারনী ছিলেন সমান পারদর্শী; যে-কারণে বিভিন্ন অডিও সিডি-নির্মাতা প্রতিষ্ঠান থেকে তার ৮০০-এরও বেশি অডিও টেপ প্রকাশিত হয়েছে। যেগুলোতে সংরক্ষিত আছে তার অসংখ্য বক্তৃতা, খুতবা, বয়ান, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতি; কিন্তু এরপরও রচনায় তিনি যে বৈভিক বৈচিত্র্যের অবতারণা করেছেন—তা আমাদেরকে বারবার আপ্লুত করে। মুগ্ধ করে। 'বিশেষ কিছু' পাওয়ার স্বাদ ও তৃপ্তিতে আশ্বস্ত করে।

ড. আয়িয আল-কারনী বিস্ময়কর ধী-শক্তির অধিকারী একজন আলিম। কুরআন হিফযের পাশাপাশি তিনি বুলুগুল মারাম গ্রন্থটিও মুখস্ত করেছেন। এছাড়াও তিনি মুখস্থ বলতে পারেন প্রায় ৫০০০ হাদীস। আর কবিতার ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ১০০০০ ছাড়িয়ে যাবে। মহামহিম আল্লাহ তাআলা তার হায়াতে বরকত দান করুন।

একজন মানুষের হাত ধরে পাল্টে গেল পৃথিবীর ইতিহাস। মোড় নিল বিশ্ব রাজনীতি। সভ্যতা পেল নতুন এক মাত্রা। সেই মানুষের হাত ধরে পৃথিবীতে আবার নেমে এলো হিদায়াতের ফল্গুধারা। মানুষটার নাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একজন মানুষ এসে পৃথিবীকে এমনভাবে নাড়িয়ে দিয়েছেন—এমন ঘটনা পৃথিবীতে আর দুটো নেই। মানবতার মুক্তির দূত এই মহামানবের জীবনী লেখক এমন ঢঙে উপস্থাপন করেছেন, পড়তে গিয়ে পাঠকের মনে হবে যেন তারা চোখের সামনেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পাচ্ছেন। বইটির নামও রেখেছেন সেভাবে—মুহাম্মাদ : কাআন্নাকা তারাহু। তার অন্যতম সেরা কাজ এই 'মুহাম্মাদ : কাআন্নাকা তারাহু'। আমরা বইটির নাম রেখেছি—নবীজি ﷺ।